সন্ধেবেলা যেমন সাপ বলতে সংস্কারে বাধে অনেকের, বলে লতা, তেমনি এই রোগের নামও নাকি বলতে নেই। বলতে হয়, 'হ্যানসেনের অসুখ'। যে-রোগে সেরে-ওঠার থেকে বড় অসুখ আর নেই। সারা পৃথিবী ফিরিয়ে নেবে মুখ। এমনকী, বাড়িতেও ফেরা কঠিন। কোনওরকমে হাসপাতালে গছিয়ে দেওয়া মানেই সম্পর্ক ঘুচিয়ে-দেওয়া। এমনই দুরারোগ্য ব্যাধি-কবলিত এক মানুষের আত্মকাহিনী শোনাতে গিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুরন্ত দক্ষতায় শুনিয়েছেন এই রোগে আক্রান্ত একটি সমাজেরই কথা, যে-সমাজ নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিল এই বিকলাঙ্গ বাতিল মানুষেরা।

সে এক আশ্চর্য আকর্ষণীয় কাহিনী। শুধু বিষয়েই অভিনব নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও তরতাজা এই উপন্যাস। পড়তে-পড়তে ভুলে যেতে হয় যে, এ-কাহিনী যিনি শোনাচ্ছেন, তিনি মুখ্যত ঔপন্যাসিক না, কবি। কিংবা এখানেই হয়তো ভুল। কবি বলেই নিশ্চিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় পেরেছেন মমতায় প্রগাঢ় দুটি চক্ষু দিয়ে এঁদের বেদনা-যন্ত্রণার পৃথিবীকে এমন অসামান্যভাবে দেখাতে, এমন জীবন্তভাবে দেখাতে।

pathagar.net

.....

ISBN 81-7066-505-1

অন্তরীপ বা
হ্যানসেনের অসুখ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

pathagar.net

আনন্দ

boierpathshala.blogspot.com

প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৯০
দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-505-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

৩০.০০

boierpathshala.blogspot.com

উৎসর্গ

সুকুমার সেনগুপ্ত
শেফালী সেনগুপ্ত

pathagar.net

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

সব পেশারই কিছু না কিছু হ্যাপা থাকে। বিশেষ ক'রে সে লোক যদি সকলের কাছে সহজলভ্য হয়।

ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হওয়ার ব্যাপারটা ডাক্তার দেখলেই সবচেয়ে বেশি রকম হয়। সামনে ডাক্তার এসে দাঁড়ানো মাত্র ভুলে-যাওয়া উপসর্গগুলো অমনি 'অ্যাটেনশন, স্যালুট !' ক'রে খাড়া হয়ে যায়।

তুলনায় কম, তবু লেখকদেরও নানা রকম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়।

ডাক্তারের কপালে নাচে রুগী। লেখকের বেলায় কিন্তু পাঠক নয়, তার বদলে জোটে লেখক। ডাক্তারে যদি রুগী টানে তো লেখকে টানে লেখক।

আগে বিয়েবাড়িতে হাতমোছার কাগুজে রুমালে পদ্য লেখার জন্যে কবিদের ডাক পড়ত। এখনকার কবিরা সে দায় থেকে মুক্ত। অবশ্য এর জয়ন্তী তার জয়ন্তী, নবজাতকের নামকরণ, শখের কাগজে (মুড়িমিছরির একদর সাব্যস্ত ক'রে ঢালাও নাম দেওয়া হয়েছে 'লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন') নিত্য লেখার তাড়না—এসব হুজ্জত হয়ত আরও অনেকদিন থাকবে।

এত ধানাই-পানাই করার দরকারই পড়ত না, যদি প্রায়ই অন্যের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমাকে হয়রান হতে না হত। আমাদের প্রকাশকেরাও চিজ বটে। মাইনে দিয়ে সম্পাদক না রেখে তাঁরা শুধু বাঘা বাঘা পত্রিকার সম্পাদকদের পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরা চান বড় জোর চেনাজানা লেখকদের সুপারিশ। বই লেগে গেলে প্রকাশকের হাতযশ, না লাগলে লেখকের মুণ্ডুপাত।

এইভাবে কত পাণ্ডুলিপি নিয়ে যে প্রকাশকদের দোরে দোরে ফেরি করে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বেশির ভাগটাই হয়েছে ভস্মে ঘি ঢালা। দুচারটি ক্ষেত্রে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও পরে প্রকাশক আর গ্রন্থকারই কৃতিত্বটা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ ক'রে নিয়েছে যে আমাকে তার একটু ক্ষুদ কুঁড়োও ছুঁড়ে দেয় নি।

ফলে, আজকাল ডাকে কোনো পাণ্ডুলিপি এলে বিরক্ত হয়ে একপাশে সরিয়ে রাখি। বাজারে জিনিসপত্রের দর যত চড়ছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধারের বহর যত বাড়ছে—দিন দিন মেজাজটাও ততই তিরিক্ষে হয়ে উঠছে। সারা জীবন ভূতের বেগার খেটেই ম'লাম। আমি চোখ বুঁজলে গোটা দুনিয়াই তখন পেছন ফিরবে। ছেলেমেয়েগুলো ভেসে যাবে, কেউ তাদের দেখার থাকবে না।

আমার আড়াই বছরের নাতনী, একালের ব'লেই, বোধহয়, আমার চেয়ে অনেক বেশি সরল। যখনই চটে যায়, খেলনাগুলো এক টানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে ব'লে ওঠে, 'ধুত্তোরি !' আমি কিন্তু ঘুরনির সেই নেড়ানেড়ির পুতুলের মত মুখে সব সময় একটা হাসি লাগিয়ে রাখি। আজকাল সেই হাসির মধ্যে একটা মিচ্‌কে ভাব থাকে। পুরনো বন্ধুরা সেটা ধরতে পারে না। আমার ধারণা, নতুনরা

boierpathshala.blogspot.com

সেটা ঠিক ধরে ফেলে।

এত কথা বলার দরকার ছিল কি ছিল না, এ নিয়ে আর বাগ্‌বিস্তার না ক'রে এবার আমি আসল কথায় আসি।

বছর দুই আগের কথা। পরের দিন আমি বাইরে চলে যাব।

এমন সময় রেজিস্ট্রি ডাকে একটা মোটা কাগজের বাণ্ডিল এসে হাজির। হাতে নিয়েই বুঝে গেলাম ঘাড়ে আবারও এক পাণ্ডুলিপির বোঝা চাপল। ফলে, 'এ-ই ম-রেছে' ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছু বেরলো না। শুনে যে যাই ভাবুক, যার ঘাড়ে পড়ে একমাত্র সেই বোঝে পরের পাণ্ডুলিপি বয়ে বেড়ানো কত বড় একটা দায়। নিজের বাক্সপেঁটরা না থাকায় হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে সব সময় কাঁটা হয়ে থাকতে হয়। প্রকাশক যদি খতিয়ে দেখতে রাজীও হয় অনন্তকাল ফেলে রেখে দিতে পারে। কিংবা যদি হারিয়েও ফেলে, শেষকালে চোর-দায়ে ধরা পড়ব আমি।

ইতিমধ্যে পাণ্ডুলিপি-লেখকের চিঠি আসতে আরম্ভ করবে। প্রথমে অনুনয়বিনয়, তারপর অনুযোগ দিয়ে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত তর্জন-গর্জন। ভূতের বেগার খেটে আমি খাব গালমন্দ আর সেইসঙ্গে আমাকেই গুনতে হবে ফেরত পাঠাবার গাঁটগচ্চা।

ফিরে এসে দেখা যাবে, এই মনে ক'রে তাকের ওপর রেখে চলে গিয়েছিলাম।

তারপর যা হয়, ফিরে এসে পাঁচ কাজের ভিড়ে পাণ্ডুলিপিটার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তবে সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, পাণ্ডুলিপি-লেখকেরাই চাবুক মেরে আমার স্মৃতিশক্তিটাকে সচল ক'রে রাখেন।

এক্ষেত্রে সে জিনিস একেবারেই না হওয়ায় কোথা দিয়ে যে দুটো বছর কেটে গিয়েছে আমি জানতেই পারি নি। ক'দিন আগে তাকের বইগুলো ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে হঠাৎ সেই না-খোলা খামটা আমার হাতে এসে গেল।

ধুলো ঝেড়ে ফেলে তৎক্ষণাৎ আমি খামটা নিয়ে ব'সে গেলাম। তখন যাবার তাড়া ছিল ব'লে প্রেরকের নামঠিকানা কিছুই দেখা হয়নি। এখন সেটা নজরে পড়ল। নাম আর ঠিকানা দুটোই দক্ষিণ ভারতের। ভেতরে কী আছে তখন তখনি না দেখার জন্যে নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। খামটা খুলে ফেলতেই দেখি ভেতরে আরও একটা মুখ-আঁটা খাম। কাগজের তাড়াগুলো তার মধ্যে। প্রথম খামের মধ্যে ছোট্ট একটা চিরকুট। তাতে ইংরিজিতে লেখা ঃ

'প্রিয় মহাশয়,—আপনার ঠিকানা-লেখা খামটি ট্রেনে কুড়িয়ে পাই। দরকারি কাগজপত্র থাকতে পারে ভেবে রেজিস্ট্রি ক'রে পাঠাচ্ছি। বৈষয়িক নানা কাজে

ব্যস্ত থাকায় পাঠাতে বেশ খানিকটা দেরি হল। আশা করি, অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি মার্জনা করবেন।'

আমার উচিত ছিল পত্রপাঠ ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্রলোককে চিঠির একটা উত্তর দেওয়া। তা তো করিই নি, উপরন্তু বিলকুল খামটার কথাই মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল। ভদ্রলোক নিশ্চয় বাঙালীদের সম্বন্ধে একটা যা তা ধারণা ক'রে বসলেন।

এখন আর কোনো চারা নেই। দু বছর পর চিঠি খুলে পড়ছি, এটা কবুল করলেও মাথা কাটা যাবে। তার চেয়ে বরং চুপ ক'রে থাকাই ভালো। পুরনো ঘা আর নতুন ক'রে খুঁচিয়ে কী হবে?

এইসব আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ভেতরের খামে ঠিকানার জায়গায় হঠাৎ চোখ পড়ল। প্রেরকের কোনো নামঠিকানা নেই। কিন্তু ও হরি, এ কী ঠিকানা আমার? ভেতরে বাইরে একই ঠিকানা। তা তো হবেই।

তিরিশ বছর আগেকার রাস্তার নাম নম্বর। তখন আশপাশের সব রাস্তারই ছিল এক নাম। বাড়িগুলোর ছিল প্লট নম্বর। ঠিকানা পালটালেও চল্লিশ বছর ধ'রে আমরা সেই একই বাসায় আছি। নইলে ঐ খাম কোনোদিনই আমার কাছে পৌঁছুত না। আমি নিজেই তো ঐ ঠিকানার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। পুরনো ঠিকানাটার সঙ্গে কত যে পুরনো কথা মনের মধ্যে ভিড় ক'রে এল বলার নয়।

তার চেয়েও বড় কথা, নেহাৎ চেনা ব'লেই রেজিস্ট্রি চিঠি হওয়া সত্ত্বেও পোস্টাপিসের পিওন বিশ্বাস ক'রে গরঠিকানার খাম আমার হাতে সেদিন তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। মনটা বারমুখো হয়ে থাকায় সেদিন কিছুই আমার খেয়াল হয়নি।

এতদিন পর খামের ভেতর কী আছে দেখার জন্যে আমার আর ত্বর সইছিল না।

দ্বিতীয় খামটা খুলতেই দেখি প্রথমেই আমাকে লেখা একটা চিঠি।

দ্বিতীয় চিঠিটাও ইংরিজিতে। কিন্তু গোড়ায় কোনো সম্বোধন বা শেষে কোনো স্বাক্ষর নেই। দ্বিতীয় খামটির গায়ে প্রেরকেরও কোনো নামঠিকানা নেই। তার মানে, আসল যে লেখক তিনি নিজেকে গোপন রাখতে চান। আমার এতক্ষণের কৌতূহল এবার কেমন যেন মিইয়ে গেল।

চিঠিতে এই আত্মপরিচয় গোপন করার ব্যাপারটা আমার একদম বরদাস্ত হয় না। মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ে জীবনে আমি যত হুল ফোটানো চিঠি পেয়েছি, তার সবই হয় বেনামী নয় নাম ভাঁড়িয়ে লেখা। তার মধ্যে এমন একটা নপুংসক ভাব

থাকে যে প'ড়ে রাগ হওয়ার বদলে গা ঘিনঘিন করে।

কিন্তু না, এটা সে ধরনের চিঠি ব'লে মনে হচ্ছে না। এর প্রথম লাইনটা একটু অন্য রকমের ঃ 'এ চিঠি যদি শেষ পর্যন্ত যথাস্থানে পৌঁছোয় তো সেটাই হবে অবাককাণ্ড।'

তার মানে, ট্রেনে ফেলে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল ইচ্ছাকৃত। তার পেছনে নিশ্চয় এ রকমও একটা বিশ্বাস ছিল যে, হয়ত কোনো সহৃদয় ব্যক্তি কুড়িয়ে পেয়ে নিজের খরচায় এটা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবেন। এই বিশ্বাসের জোর কতটা ছিল তা নিয়ে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার কোনো মানে হয় না।

তবে একটা ঝুঁকিও যে নেওয়া হয়েছে তাতে সন্দেহ-নেই। নিরক্ষর ঝাড়ুদারের হাতে পড়লে এর কী দশা হত বলা যায় না। তাছাড়া গোড়াতেই তো গলদ। ভুল ঠিকানায় লেখা চিঠি শেষ অবধি যে ঠিক জায়গায় পৌঁচেছে এটাই তো একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

কোনো নাম না থাকায় বোঝা যায়, লেখক এর ওপর তাঁর কোনো স্বত্ব আরোপ করেন নি। দুটো কারণে এটা হতে পারে। এক ঃ স্বত্ব দাবি করলে সেইসঙ্গে তার দায়ও বর্তায় যে দায় লেখক ঘাড়ে নিতে চান না। দুই ঃ লেখক একেবারেই সাধু প্রকৃতির মানুষ—নিষ্কাম এবং নির্মোহ।

লেখাটির পরিণাম সম্পর্কে লেখক যে পুরোপুরি নিঃস্পৃহ ছিলেন, আমার তা মনে হয় না। কেননা তাহলে ট্রেনে না ফেলে লেখাটি তিনি স্বচ্ছন্দে জলে ফেলে দিতে পারতেন। কারো হাতে লেখাটি তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ঠিকানা থেকে সেটা স্পষ্ট।

হয়ত নিজের খরচায় পাঠাবার তাঁর সঙ্গতি ছিল না।

কিন্তু তারপরও অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। ডাক খরচা দিয়ে যিনিই পাঠিয়ে থাকুন, আসল প্রেরক হিসেবে লেখককেই ধরা উচিত। সে ক্ষেত্রে প্রেরক আর প্রাপকের মধ্যে সম্বন্ধটা কি নিতান্তই আপতিক ?

চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই কেন ? পাছে কেউ কিছু আঁচ করে সেই ভয়ে ? বাংলায় লেখা হলে আপনি-তুমির ভেদ থেকে চেনা-অচেনা অগ্রজ-অনুজ নির্দেশ করা যেত। ইংরিজির 'ইউ' সেদিক থেকে একেবারেই দুর্ভেদ্য।

লিখেছে কি আমার কোনো পুরনো বন্ধু ? তিরিশ বছর ধ'রে যার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই ?

যেই লিখে থাক, তার বয়স যে পঁয়তাল্লিশের একচুল এদিকে নয়, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

কিন্তু আমাকে পাঠানো কোন্ সুবাদে ? লোকে যখন থেকে আমাকে লেখক হিসেবে চেনে জানে, তার ঢের আগেই আমাদের রাস্তার নাম নম্বর পালটেছে।

যে আমাকে লেখক হিসেবে জানে না, আমাকে তার এটা পাঠানোর উদ্দেশ্যই বা কী ?

আমাকে আরও বেশি ধাঁধায় ফেলেছে গোটা লেখাটাই ইংরিজি ভাষায় হওয়ায়।

অবশ্য এটা ঠিক, আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকে ছিল যারা বাংলায় লেখাটা মানহানিকর ব'লে মনে করত। আমরা একটু আধটু বাংলার চর্চা করতাম ব'লে আমাদের তারা কতকটা ছোট নজরে দেখত।

কিন্তু একজন ছাঁ-পোষা ভেতো বাঙালীকে তাদের কেউ ইংরিজিতে লেখা পাণ্ডুলিপি পাঠাতেই বা যাবে কেন ?

তবে কি ?

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, শুনেছিলাম আমার এক আত্মীয় অন্ধ্র প্রদেশের কোন্ একটা জায়গায় যেন স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছে। ছেলেবেলায় একবার কোনো এক বিয়ে উপলক্ষে তাদের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা একদম বাংলা জানে না।

তাদের বাড়ির কেউ হবে কি ?

কিন্তু পুরনো ঠিকানাটা তাদের পক্ষে যদিও বা জানা সম্ভব হয়, আমার ভালো নাম তাদের জানা সম্ভব নয়।

ফলে, যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছি।

pathagar.net

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, রহস্য উদ্ধারের রাস্তায় গিয়ে লাভ নেই। তাতে মিছিমিছি সময় নষ্ট।

তার চেয়ে বরং পাণ্ডুলিপিটাতে কী আছে দেখা যাক।

দেখে মনে হয়, অনেকদিন ধ'রে একটু একটু ক'রে লেখা। নানা ধরনের এবং নানা সাইজের কাগজ। কখনও কলমে লেখা, কখনও ডট পেনে। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর। তবে পড়া যায়। ভাষায় খুব একটা ঘোরপ্যাঁচ নেই, আটপৌরে সাদামাঠা। ব্যাকরণ আর বানান, দুদিক থেকেই লেখকের বেশ একটা ডোণ্টকেয়ার ভাব।

অবশ্য, তাতে কিছু যায় আসে না। লেখক লিখেছেন ইংরিজিতে, আর আমি তাঁর কথাগুলো বাংলা ক'রে বলব।

লেখকের নিজের গলা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না। আপনারা বাংলায় শুনবেন শুধু দোভাষীর কণ্ঠস্বর। তাকেই লেখকের কণ্ঠস্বর ব'লে ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর অনুযোগ করলে আমি নাচার।

এই প্রসঙ্গে আগেভাগে কয়েকটা কথা না ব'লে পারছি না।

নামের ব্যাপারে লেখকের মনোভাবটা একটু অদ্ভুত। লেখক তাঁর নিজের নাম তো চেপে গেছেনই, এমন কি যাদের নিয়ে লিখেছেন তাদেরও কারো নাম তিনি প্রকাশ করেন নি।

এইসূত্রে অনেক দিন আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চাটুজ্যে একবার এক ফরাসী লেখিকার সঙ্গে আলাপ করানোর জন্যে তাঁর বাড়িতে আমাদের ডেকেছিলেন। পরিচয়সূত্রে জানাগেল, তিনি তাঁর উপন্যাসে নায়কনায়িকার কোনো নাম ব্যবহার করেন না। ভদ্রমহিলা সেদিন যেসব লম্বাচওড়া কথা বলেছিলেন, তাকে আচ্ছা ক'রে ঠাসলে রবীন্দ্রনাথের সে-র সেই সারমর্মটা বেরিয়ে আসবে ঃ 'নাম বলি নে কেন। নাম বললে ইনি যে কেবল ইনিতেই এসে ঠেকবেন, এই ভয়।'

ব্যাপারটা এই জন্যেই তুললাম যাতে নাম না থাকার পেছনে আমার হাত আছে ব'লে কেউ না মনে ক'রে বসেন।

আরও একটা কথা, যেখানেই 'ইউ' আছে সেখানেই আমাকে নিজের বিচারবুদ্ধিমত আপনি-তুমির ভেদ আনতে হয়েছে। সব জায়গায় সেটা লেখকের অভিপ্রেত নাও হতে পারে।

সবচেয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছে সংলাপের ব্যাপারে। আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় আমার আদৌ দখল নেই, এটা অকপটে স্বীকার করছি। ফলে, অনেক জায়গাতেই ভাববাচ্যের আড়াল নিতে হয়েছে। ইংরিজি-লিখিয়েরা তো মনের আনন্দে ডায়লোগ দিয়ে খালাস—বাংলায় তার ঠেলা সামলাতে গিয়ে আমাদের হয় মরণ।

মূলের লেখক হয়ত এমনও চেয়ে থাকতে পারেন যে, তাঁর তৈরি খড়ের কাঠামোতে মাটি আর রং জুড়ে আমি একটা সুন্দর মূর্তি গড়ে দেব।

এ ব্যাপারে আমার সোজা কথা ঃ নিজের জ্বালাতেই বাঁচছি নে, পরের ভাবনা কেন সাধ ক'রে মাথায় নিতে যাব ?

তবে হ্যাঁ, পরের কথা বলতে গিয়ে অবরে-সবরে যদি নিজের কথা বলার একান্তই কোনো দরকার হয় সেটা আমি নিজের জবানিতেই আলাদাভাবে বলব।

এবার আমি আরম্ভ করছি। আমার গলায়, শুনুন, লেখকের কথা ঃ

pathagar.net

॥ ১ ॥

হাসপাতাল সাফ ব'লে দিয়েছে, আর নয়। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই এবার দেখে নিতে হবে।

সাহেব-ডাক্তার লোক বড় ভালো। শরীরে দয়ামায়া আছে। নইলে সেরে গিয়েও এই একটা বছর থাকলাম কেমন ক'রে ?

তুমি সেরে গেছ, তোমার আর অসুখ নেই। শুনে শুনে কান পচে গেছে। কিন্তু এই রোগে সেরে যাওয়ার চেয়ে বড় অসুখ আর নেই। তুমি জানো না, না ? ন্যাকা ! তুমি হাড়ে হাড়ে জানো, সেরেছ কি মরেছ ! এখান থেকে গেলে দুনিয়ার কোথাও তোমার ঠাঁই হবে না। নরকেও নয়।

দেখছি তো ! বাড়ির লোকজন যখন দিয়ে যায়, হাপুস নয়নে সে কী কান্না। মাটি অবধি ভিজে কাদা হয়ে যায়। দেখে আমাদের মতন পাষাণহৃদয়ও তালুর গায়ে জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করে। যাবার সময় ঝুড়ি ঝুড়ি সান্ত্বনা আর পিপে পিপে আশ্বাস।

যাওয়ার পর মন টেঁকানোর জন্যে একটা দুটো চিঠি ঠিকই আসে। মধ্যিখানে একবার দুবার কেউ না কেউ এসে দেখেও যায়। তারপরই ভোঁ ভাঁ। রুগী যত ভালো হয়, ততই খবর নেওয়ায় ভাঁটা পড়তে থাকে। দিনে দিনে রুগীরও জ্ঞানচক্ষু খোলে। নতুন পরিবেশে গোড়ায় তার যতটা অসহ্য লেগেছিল, আস্তে আস্তে সেটা সয়ে যেতে থাকে। স্নেহমমতার ঘনবদ্ধ খাপি ভাবটা কি রকম জ্যালজেলে হতে হতে ফদাফাঁই হয়ে যায়। পুরনো মুখগুলো সব দোকানের মুখোশের মত স্মৃতির দেয়ালে সার বেঁধে ঝুলতে থাকে।

তারপর একদিন হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার সেই চরম দিনটা এসে যায়। আগেই বাড়িতে নিয়মমত খবর যায়। কেউ নিতে আসবে না সবাই জানে। তবু অপেক্ষা করাটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই জানে এ রোগে হাসপাতালে গছিয়ে দেওয়া মানেই সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয়া।

রুগ্ন অবস্থায় লোকে তবু একটু ভয় পায়। বাড়ির লোকে ছুটোছুটি শুরু ক'রে দেবে হাসপাতালে দেওয়ার জন্যে, চেষ্টার ত্রুটি হলে পাড়ার লোকের চাপ পড়বে। আর নিরুপায় রোগগ্রস্ত কাউকে যদি রাস্তায় এসে বসতেও হয়, জনমতের ঠেলায় তারা সটান হাসপাতালে পৌঁছে যাবে। রাস্তায় পড়ে থাকলে ভয় আছে, দেখায়ও খারাপ।

মরে গেলে আপদ যেত, কিন্তু সেরে গেলে ?

এই সেরেছে !

প্রিয়জনকে ঘরের বার করে দিতে বুক ফেটে যায় বৈকি। হাজার হলেও আপন জন! কিন্তু তাই ব'লে একজনের জন্যে বাকি সবাইকে জলে ফেলে দেওয়া—সেটাই বা কেমনধারা কথা?

ভালবাসা, নাড়ির টান, রক্তের সম্পর্ক—সবই কিছুদূর অবধি। ফিতে দিয়ে সব কিছু মাপা যায়।

তবে মনে রেখো, খুব বেশি চাপ পড়লে অমন যে মন—সেই মন পর্যন্ত পাথর হয়ে যায়।

মনে আছে, গেল যুদ্ধে কাতারে কাতারে লোকে হাঁটা পথে বর্মা থেকে ফিরে এসেছিল? ছেলেবেলা কী ইচ্ছেই না হত তাদের মুখে গল্প শোনার। যখন সুযোগ এল তখন আমি যথেষ্ট সাবালক। বলা যায়, প্রমাণ সাইজের মানুষ। এক মফস্বল শহরে কাজের সূত্রে বর্মাপ্রত্যাগত এক ভদ্রলোককে পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে ধরে বসলাম, বর্মা থেকে ফেরার সময়কার রাস্তার গল্প একটু বলুন।

ভদ্রলোক খুব বেজার মুখ ক'রে ঠোঁট উলটে বললেন, বলবার আর আছে কী, সবাই তো সব জানে।

ভদ্রলোক যাতে পাশ কাটিয়ে যেতে না পারেন, তার জন্যে আমি খানিকটা ঢ্যাঁটার মত লেবু কচলানোর ভাব নিয়ে বললাম, তবু!

এরপর যে কাণ্ডটা হল, তার জন্যে আমি বিন্দুমাত্র তৈরি ছিলাম না।

ভদ্রলোক করলেন কী, ফট্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে আমার নাকের সামনে দু হাতের বুড়ো আঙুল দুটো উঁচিয়ে মুখটা বীভৎস ক'রে গলাটা বিকৃত ক'রে ব'লে উঠলেন, ত-বুও! শুনুন তবে এই ছাই আর এই পাঁশ! আপনার মাথা আর আমার মুণ্ডু! ব'লে তৎক্ষণাৎ গট গট ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো তাজ্জব। সেই সঙ্গে অপ্রস্তুতেরও একশেষ। মাথায় ছিট না থাকলে কেউ ও-রকম ব্যবহার করতে পারে, এটা ভাবাই যায় না।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম ভদ্রলোকের মাথার দোষ আছে।

এর ক'দিনের মধ্যে একটা কিম্ভুত-স্বপ্ন দেখে মনে হল ওটা ওভাবে এককথায় উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার নয়। এখনও খানিকটা ভাসা-ভাসাভাবে স্বপ্নটা মনে আছে।

একটা বিশাল বন। তার ভেতর দিয়ে রাস্তা। দুপাশে গাছের গায়ে মেঘগুলো যেন পার্কের রেলিঙে ভিখিরিদের শুকোতে-দেওয়া ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের মত ঝুলছে। হঠাৎ সব কিছু কালো হয়ে গেল। সোঁ সোঁ ক'রে দমকা হাওয়া বইতে লাগল। কেউ যেন হেঁচকা টানে পা সরিয়ে নিল আর সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে একটা

চিলচিৎকার : 'যেও না, আমাকে ফেলে যেও না।' হঠাৎ নারীকণ্ঠটা একটা শিশুকণ্ঠের কান্নার সঙ্গে মিশে গেল।

পরে ভেবে দেখেছি, স্বপ্নটা আকাশ থেকে পড়ে নি। বর্মা থেকে আসা পথের লোকদের সঙ্গে কখনও সখনও দেখা হয়েছে। টুকরো টুকরো গল্প এর ওর মুখে শুনেছি। যৌতুকের টাকা না পেয়ে বউকে যে মানুষ পুড়িয়ে মারতে পারে সেই মানুষ নিজের প্রাণের মায়ায় কী না করতে পারে ? কিন্তু নিষ্ঠুরতার স্মৃতিগুলোকে কেউ যদি খুঁচিয়ে তুলতে যায়, তখন তার হাত এড়াবার জন্যে একটা উদ্ভট কিছু তো সে ক'রে বসবেই।

আমার ঘোরতর সন্দেহ, ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই একটা রাখঢাকের ব্যাপার ছিল। অপরাধ—হ্যাঁ, অপরাধ। তবে কতটা গুরুতর ধরনের জানি না। খুব আপন কাউকে অসহায়ভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে আসা থেকে আরম্ভ ক'রে অশক্ত কোনো মানুষকে টুঁটি টিপে মেরে তার যথাসর্বস্ব হাতিয়ে নেওয়া—সব কিছুই হতে পারে।

যাই হোক, এরপর থেকে কৌতূহল প্রকাশের ব্যাপারে আমি অনেক বেশি সাবধান হয়েছি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কখন আবার কী সাপ বেরিয়ে পড়ে, আমার সেই ভয়।

পূর্বাশ্রম ব'লে একটা কথা আছে। সন্ন্যাসী হওয়ার আগের জীবন সম্পর্কেই কথাটা বলা হয়। পূর্বাশ্রমে কে কী ছিলেন সেটা সাধারণত তাঁরা ভাঙতে চান না।

পূর্বাশ্রমের কথাটা পারতপক্ষে আমরাও বলি না। ওটাকে আমরা গত জন্ম বলেই ধরে নিই।

জানেন তো, সন্ধ্যে হলে সাপ বলতে নেই। বলতে হয় লতা।

উঁহু, ওটা বলবেন না। বলুন, 'হ্যানসেনের অসুখ।' কথাটা মনে হলেই হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরার যোগাড় হয়।

বলুন 'হ্যানসেনের অসুখ।' ব্যস, আর কোনো গোল থাকবে না। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ ! ভবী ভোলানো যেন অতই সহজ ! আর মানুষ সেই পাত্র !

পদ্মলোচন বা সুরদাস যে নামই রাখুন, যে কাণা ছেলে সে কাণা ছেলেই থাকবে।

বাড়ির যে হিসেব, তাতে আমরা সব খরচের খাতায়। মাথা গুন্‌তিতে একজন নেই। একদিন ছিল, এখন নেই—এমনও নয়। ছিল বললেই তো লোকে তখন জানতে চাইতে পারে তিনি গেলেন কোথায়। মরে গেলে কোনো ল্যাঠা নেই। থেকেও না থাকাটা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

pathagar.net

মরে গেছে বলা যেত। কিন্তু বলতে গেলেই স্মৃতিতে সে এসে উদয় হবে। তাতে মন খারাপ হওয়ারও ভয় থাকে। হাজার হোক আপন জন। রক্তের সম্পর্ক—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার চেয়ে ও-পাট একেবারে চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। কোনো ফাঁক না রাখা। একটিকে বাদ দিয়ে বলুন—আজ্ঞে, আমরা দুই ভাই; কিংবা আমার ঐ একটিই ছেলে।

কথা কী জানেন, মানুষের অসম্ভব নাক। ঠিক কুকুরের মতন। কোনো চিহ্ন থাকলে শুঁকে শুঁকে ঠিক অপরাধীকে খুঁজে বার করবে। সুতরাং কোনো চিহ্ন রাখতে নেই।

একটি লোক কর্পূরের মত বেমালুম উবে যাক। দরকার হলে এমন জায়গায় গিয়ে ডেরা নিন, যেখানে কেউ আপনার হাঁড়ির খবর রাখে না। কেউ জানবে না যে, মাথা গুন্‌তিতে আপনারা একজন কম। কে সে, কী বৃত্তান্ত—কারো মনে এসব প্রশ্নই উঠবে না।

শুনি নাকি মরার বাড়া গাল নেই।

আছে। তার প্রমাণ আমরা। আমাদের মধ্যে যাদের নাকগুলো রোগে খেয়ে নেয়, তারা ভুত আর শাঁখচুন্নির মত খোনা গলায় কথা বলে। রাতবিরেতে আমাদের কাউকে আচমকা দেখলে লোক ভুতের ভয়ে মূর্ছা যাবে। অথচ ভুতদের যে সুবিধে আছে আমাদের তা নেই। ভুতে মারে ঢেলা। আর আমাদের উল্টে ঢিল খেতে হয়। ভুতকে ঢিল যদি মারাও হয়, ভুতের লাগে না। আমাদের ঢিল মারলে লাগে। ভীষণ লাগে। রক্ত বেরোয়।

pathagar.net

॥ ২ ॥

আমার কেস্‌টা একটু আলাদা। ঠিক অন্যদের মত নয়।

থেকেও না থাকাটা আমার বেলায় খাটে না। আমার বাড়ির কথা যদি বলেন, সেখানে আমি না থেকেও আছি। শুধু আছি বললেও পুরো বলা হয় না। আমার অস্তিত্বটা সেখানে খুবই জাগ্রত।

বাড়ির বার হয়ে গিয়েছি সেই কবে, তবু সবাই এখনও আমাকে বাড়ির একজন বলেই মনে করে। আমার ধারণা, বৈঠকখানায় বড় ক'রে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে আমার একটা ছবি। জন্মদিনে তাতে হয়ত মালাও পরানো হয়।

আমার এই পূর্বাশ্রমের কথা আমি কাউকে বলি না। বললে এরা সবাই আমাকে হিংসে করবে। অথচ পুরোটাই একটা ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপার।

আমি মোটেই হেঁয়ালি করছি না। একটু ভেঙে বললেই সেটা বোঝা যাবে।'

ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম।

সকালের ফ্লাইটে যাচ্ছিলাম দিল্লী। প্লেনের মধ্যে সদ্য ব্রেকফাস্ট শেষ ক'রে ব্রিফকেস থেকে আপিসের কাগজপত্র বার করেছি। তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে জুত হয়ে ব'সে একটা একটা ক'রে ফাইলের পাতা উল্টে যাচ্ছি। এক মক্কেলের সঙ্গে সেদিনই এক জরুরী কনফারেন্স। আমার ডানহাতটা অ্যাশট্রের ওপর রাখা ছিল।

হঠাৎ আমার হাতের ওপর চটাস ক'রে একটা চাপড় পড়তেই জ্বলন্ত সিগারেটের শেষটুকু অ্যাশট্রের ভেতরে ছিট্‌কে পড়ল। আমি তো ভয়ে চম্‌কে উঠেছি। পরক্ষণেই বুঝলাম আমার ঠিক ডান পাশের সীটে যে বয়স্ক ভদ্রলোকটি বসেছিলেন এই অভদ্র ব্যবহারটা তিনিই করেছেন। এরোপ্লেনের মধ্যে এ কোন্ ধরনের আগুন নিয়ে খেলা। যদি জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠিক্‌রে বাইরে পড়ত? প্রচণ্ড রাগ হল। কিন্তু আমি অজান্তে তাঁর গায়ে যদি ছ্যাঁকা দিয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই দোষটা আমারই, এই ভেবে সেভাবে রাগও দেখাতে পারছি না। সব মিলিয়ে একটা ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা।

ততক্ষণে ভদ্রলোকের মুখটা নজরে পড়েছে। সে মুখে রাগ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। দেখে মনে হল, ভদ্রলোক খুব শান্ত মুখে আমাকে কিছু একটা বলতে চান।

আর ঠিক তারপরই উনি আমার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনার আঙুল পুড়ে যাচ্ছিল যে, আপনি টের পান নি?'

ওঁর মুখের ভাব আর গলার স্বর আমার সব রাগ জল করে দিল।

আমি নম্রভাবেই উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে, না তো!'

ভদ্রলোক দুটো হাতলে হাতে ভর দিয়ে একটানে শরীরটা আমার দিকে ফিরিয়ে একবার আমার মুখের ওপর চোখদুটো বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনার হাতটা একটু দেখব?'

মনে মনে বললাম, 'কী অদ্ভুত লোক রে, বাবা! আবার হাতও দেখতে চায়।'

মুখে দেখান-হাসি ফুটিয়ে হাতের চেটোটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। দেখলাম হাতের চেটোর চেয়ে উল্টোপিঠটাতেই ওঁর বেশি আগ্রহ। ভদ্রলোক আমার আঙুলগুলো টিপে টিপে দেখতে লাগলেন। লোকটা যদি ঠক হয়, তাহলে এখুনি বলবে, 'আপনার তো দেখছি রাজভাগ্য।' এবার আমিও ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ শুনলাম ভদ্রলোক বলছেন, 'আপনার লাগছে?'

তাকিয়ে দেখি উনি ওঁর আঙুলের নখ আমার একটা আঙুলের গায়ে বেশ

জোরে চেপে রেখেছেন।

বেশ তাচ্ছিল্য ক'রেই বললাম, 'কিস্যু না।'

এরপর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক একটু গুম হয়ে বসে রইলেন।

ভদ্রলোকের আবোল তাবোল ব্যবহারে আমি খানিকটা বিরক্তই হয়েছিলাম আরও বেশি অপ্রসন্ন হয়েছিলাম এই জন্যে যে, জরুরী কাগজপত্রগুলোতে এরপর কিছুতেই আর মন বসাতে পারছিলাম না ব'লে।

শেষ অবধি পালাম পৌঁছে অ্যারাইভাল লাউঞ্জে পেছন থেকে এসে আমাকে ধরলেন, 'এক মিনিট আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।' দুজনেই একপাশে একটু সরে গেলাম। উনি তখন গলা নামিয়ে বললেন, 'আমি জানি আপনি আমার ব্যবহারে বিরক্ত। আমি তার জন্যে সত্যি দুঃখিত।' ব'লে ভদ্রলোক একটু থামলেন। তারপর আমার দুটো হাত ধ'রে বললেন, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন। আজ কিংবা কালকের মধ্যেই একজন ভালো ডাক্তারের কাছে গিয়ে আপনার অসাড় আঙুলগুলো একটু দেখিয়ে নেবেন।' কথা শেষ করে তাঁর অ্যাটাচিকেসটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক গট্ গট্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। আমি তাঁর অনুরোধ রেখেছিলাম।

আমার মন বলছিল, ডাক্তারের মুখ থেকে খারাপ কিছু শুনব। কিন্তু সে খারাপটা যে এই পর্যায়ের হবে আমি ভাবি নি।

কুষ্ঠ। ছোট্ট একটা শব্দের মধ্যে যে এত জোরে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে, আগে কখনও ভাবি নি। হাতল দুটো শক্ত করে ধরে থাকায় চেয়ার থেকে পড়ে যাই নি। আমার মুখটা নিশ্চয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সেরে উঠবেন।'

কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছিল না। চেম্বার থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, আমার গোটা শরীরেই যেন কোনো সাড় নেই। বাইরে এসে দেখি সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের নিচে টলছে।

এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্যারাসুট না খোলা অবধি যে অবস্থাটা হয় আমারও হল সেই রকম হাল।

সোঁ সোঁ করে নামতে নামতে হঠাৎ এক সময়ে প্যারাসুটটা ছাতার মত খুলে যায়। পায়ের নিচে জমি না পেলেও শূন্যের মধ্যেই ভাসতে ভাসতে একটু করে ক্ষণস্থায়ী ঠাঁই মেলে। শেষ পর্যন্ত ধপাস করে মাটিতে পড়া—একমাত্র তখনই যা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

সত্যি বলতে কি, সেদিন থেকে আজ—পড়া, ভাসা আর ঠেকা, এই নিয়ে আমার দ্বিতীয় পর্বের গোটা জীবন।

পরের কথা পরে। আগেরটা আগে শেষ করে নিই।

তারপর তো কনট সার্কাস ধরে খানিকটা আমি হেঁটে বেড়ালাম। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, একটু আগেও আমি যা ছিলাম এখন আর তা নই। চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ যেন আমাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার জন্যেই যেন হাত নেড়ে নেড়ে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তার কান-ফাটানো বাঁশি।

রাস্তার কোনো সুস্থ লোককেই আমি সহ্য করতে পারছি না। নিজেকে যতই অসুখী মনে হচ্ছে, ততই সুখ সম্ভোগের জন্যে একটা হন্যে হওয়া ভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে। কেউ যেন আমার হাতে রঙীন একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে আমার রক্তের মধ্যে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে চোখ নাচিয়ে কানের কাছে বলছে—এ সুযোগ হারিও না, অদ্যই শেষ রজনী।

মনে আছে আমি একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছিলাম। আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল এমন এক জায়গায় যেখানে মদ আর মেয়েমানুষ, দুটোই চাওয়ামাত্র পেয়ে গিয়েছিলাম।

এমন একটা কাণ্ড করে বসতে পারি, আগে হলে এটা ভাবাই যেত না। উড়তে উড়তে একটা ঘুড়ি যদি হঠাৎ উপ্‌ড়ে যায়, তাহলে তার যা দশা হয় আমারও হল সেই রকম। সমাজ সংসারে আমার আর কোনো টান রইল না।

তখন আমার একটাই তাড়না—নিজেকে খুইয়ে ফেলা। স্নেহ-ভালবাসা মায়া-মমতা—সব কিছুর বার হয়ে যাওয়া।

আমার ভেতরে ফুঁসছে একটা অন্ধ রাগ। ঘৃণা ছাড়া তখন আমার শরীরে আর কিছুই নেই।

চোখ তাকিয়ে থাকলেও আমার চোখে বোধ হয় দৃষ্টি ছিল না। গেলাসের পর গেলাস গিলেছি। কিন্তু কী খাচ্ছি চেয়ে দেখি নি। এই প্রথম একটি মেয়ের প্রতি আমি জানোয়ারের মত ব্যবহার করেছি। আমি তার মুখের দিকে বোধহয় একবারও তাকাই নি।

এর পর আমি কী করব সে বিষয়ে মন স্থির করেই রেখেছিলাম। পরের দিন এয়ারপোর্টে নেমে সোজা আপিসে চলে গিয়ে আপিসের কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে এলাম। সেই সঙ্গে চেয়ে নিলাম দিন দুয়েকের ছুটি। আমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, এবারকার সফরে বেশ ধকল গেছে। আমার মধ্যে একটা অন্যমনস্ক ভাব নিশ্চয়ই সকলে লক্ষ্য করে থাকবে।

॥ ৩ ॥

বাড়ি ফিরে মাত্র দুটো দিন ছিলাম।

এই দু দিনের কথা ছাড়াছাড়া ভাবে মনে আছে। ফ্ল্যাটের দরজায় বেল টিপে আমি এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম যেন আমি বাইরের লোক। ভেতরে গিয়েও চেয়ার টেবিল সোফা—কিছুই আমার নিজের বলে মনে হচ্ছিল না।

ছেলেটা কত বার যে হাত বাড়িয়েছে কোলে আসার জন্যে, আমি কায়দা করে এড়িয়ে গিয়েছি। যে করেই হোক আমাকে ছোঁয়াছুঁয়িটা বাঁচিয়ে চলতে হবে। বাড়িতে এসেই বলে দিয়েছিলাম আমি আর মাছ-মাংস খাব না। রোগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, তবে আমার কেমন যেন গন্ধের একটা বাতিক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আঁশটে গন্ধটা কিছুতেই আমার সহ্য হচ্ছিল না। বসার ঘরে গোছা গোছা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে অনেক রাত অবধি পড়েছি। বাবার কিছু ধর্মগ্রন্থ ছিল ; এই প্রথম ধুলো ঝেড়ে সেগুলো টেনে বার করলাম।

আমার স্ত্রী ছিল গোয়ার মেয়ে। গায়ের রঙে আর নীলচে চোখে পর্তুগীজ রক্তের একটা ক্ষীণ আভাস ছিল। ছাত্রাবস্থায় বোম্বাইতে আমাদের আলাপ। আমার মা মারা যান আমাকে ছোট রেখে। বলতে গেলে বাবার কাছেই আমি মানুষ। বাবার ছিল পড়ার নেশা। দিনের বেলায় প্রায় উদয়াস্ত কাটত তাঁর নিজের ছোট্ট আপিসে—আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ নিয়ে। সন্ধ্যের পর তাঁর নিত্যসঙ্গী বই আর ব্র্যাণ্ডি। আমি চাকরি নেওয়ায় বাবা খুশী হয়েছিলেন। বিয়ের ব্যাপারে বাবার পুরোপুরি সায় থাকলেও মন স্থির করতে আমারই এমন দেরি হয়ে গেল যে বাবা শেষ পর্যন্ত আর আমাদের বিয়ে দেখে যেতে পারলেন না।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বাবার আকর্ষণ থাকলেও সংশয় ছিল তাঁর মজ্জাগত। ধর্মের বাহ্য আচারগুলোতে তাঁর মন কখনই সায় দিত না।

ছোটবেলা থেকেই খানিকটা শেকড়হীনভাবে মানুষ হয়েছি। নিকট আত্মীয়দেরও কাউকে কখনও দেখি নি। বাবার মতই আমারও ছিল চাপা স্বভাব। ভেতরে ঝড় বইলেও মুখে তা প্রকাশ পেত না।

থাক সেসব পুরনো কথা।

আজ আর আমার রক্তের সম্বন্ধ বলে কিছু নেই। অতীতকেও আমি মুছে দিয়েছি।

আমাকে যারা চিনত, তারা নিশ্চয় ধরেই নিয়েছে আমি সাধু হয়ে কোথাও চলে গিয়েছি।

অসুখটা যখন ধরা পড়ল, তখন প্রথমেই আমার আত্মহত্যার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাবতে গিয়ে ভয় হল। আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি, তাতে মৃত্যুর পর কিছু আছে—এ ধরনের কোনো ভাবনা আমার মধ্যে ঠিক দানা বাঁধতে পারে নি। কিছু নেই, শুধু শূন্যতা—এমন একটা অন্তহীন একঘেয়ে অবস্থার কথা ভেবেই আমি পিছিয়ে গিয়েছিলাম।

জীবনকে নাকচ না করে আমি বেছে নিয়েছিলাম দ্বিতীয় এক জীবন।

শেষ রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি উত্তর ভারতের ট্রেনে উঠে বসেছিলাম। আমার ভেতরে তখন যেন গুম-গুম গুম-গুম শব্দে ফেটে বেরোচ্ছে আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা। সেই তোলপাড় অবস্থাটা যখন থিতিয়ে এল আকাশ তখন আস্তে আস্তে ফরসা হয়ে আসছে। আমার মনে হল, জীবনে যেন আমি এই প্রথম সকাল দেখছি। তার পর তিন দিন তিন রাত ঠায় জেগে থাকা দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

আমি সাধু হব বলে সংসার ছেড়েছিলাম, এটা সত্যি নয়। আবার এও ঠিক, আমি বেরিয়েছিলাম সাধু-সন্ন্যাসীদেরই খোঁজে।

আমি চেয়েছিলাম আমার জন্যে আমার স্ত্রী-পুত্রের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। আমি স্থিরনিশ্চিত ছিলাম যে, নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে ফেলতে না পারলে ব্যাপারটা জানাজানি হতে সময় লাগবে না।

আমি ছিলাম চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট। কাজেই আমার হিসেব ছিল নিখুঁত। একসঙ্গে তিনটি জীবন নষ্ট হওয়ার চেয়ে একটি জীবন নষ্ট করলে লাভ বেশি।

আজ বুঝি, সে হিসেবও ঠিক ছিল না। প্রথম জীবনের চোখে যাকে নষ্ট হল বলে মনে করেছিলাম দ্বিতীয় জীবনের দৃষ্টিতে তার অন্য রূপ।

মাটি থেকে কোনো গাছ তুলে টবে বসাতে গেলে কিছু কিছু শেকড় টান লেগে ছেঁড়ে। ব্যথা তো লাগবেই। কাটা গিয়ে যাদের একটা হাত কি একটা পা থাকে, আস্তে আস্তে তাদেরও তো সয়ে যায়।

আমারও হয়েছিল তাই।

গোড়ায় গোড়ায় কষ্ট হয়েছিল ঠিকই। দারুণ কষ্ট। কিন্তু আমি তো আর তখন স্বাভাবিক নই। শখ করেও সংসার ছাড়ি নি। আমার ভেতর তখন একটা গনগনে আঁচে পুরনো কত কিছু যে পুড়ছে বলার নয়।

কিন্তু তখনও একটা ক্ষীণ আশা—কোথাও যেন কিছু একটা মিলে যাবে, যার ফলে আমি আবার ঠিক আগের মত হয়ে যাব। কেউ বুঝবেই না আমার কখনও কিছু হয়েছিল বলে। বাড়ি ফিরে বলব, ঘরের বাইরে গিয়ে নতুন মানুষ হয়ে এলাম।

একটা কোনো মির‍্যাকল্ ঘটবে। কোথাও কারো অঘটন ঘটনপটিয়সী কোনো

শক্তি আমাকে বদ্‌লে দেবে।

প্রথম পাঁচটা বছর আমার এইভাবেই কেটে গেল।

বাড়ি ছাড়ার পরই আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। এইখানে সেটা বলে নেওয়া ভালো।

হঠাৎ এক সময়ে আমার মনে হল, একই আমি দুই হয়ে গিয়েছি। জেগে থাকার প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি যেন আর কেউ হয়ে নিজেকে দেখছি। শরীরটা যেন আমার হয়েও আমার নয়।

গৃহপালিত আমার আগের জীবনের সঙ্গে এ জীবনের এতই অমিল যে আগে হয়ত স্বপ্নেও কখনও এই অনভ্যস্ত জীবনযাপনের কথা ভাবতেই পারতাম না। নিজেকে আর কেউ বলে ভাবতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই আস্তে আস্তে আমার সয়ে গেল।

এসব ক্ষেত্রে মানুষকে সবচেয়ে মুশকিলে ফেলে তার স্মৃতি। আরেক আমিকে দিয়ে আমি সেই মুশকিলের আশান করেছি, যে আমার সামনে যেন উবু হয়ে বসে জুল্‌ জুল করে চেয়ে থাকে। আমি যাই করি না কেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। আমি তাকে সামনে রাখি। কিছুতেই পেছনে যেতে দিই না। পাছে পুরনো স্মৃতিগুলোকে খুঁচিয়ে তোলে।

সব তীর্থই আমার ঘোরা হয়ে গেছে। হিমালয়ে গিয়েছি দুর্গম সব গুহাগুম্ফায়। অমুক পীর তমুক পীরের দরগায়। তান্ত্রিক সাধু দেখেছি। ফকির দেখেছি। কাউকে কাউকে মনে হয়েছে অসাধারণ আশ্চর্য মানুষ।

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হলে বাকি জীবনটা আমি হয়ত তাদের পদাশ্রয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার শরীরে যে চিহ্নগুলো আস্তে আস্তে ফুটে উঠছিল, কোনো ধুলোপড়া কোনো জড়িবুটি দিয়েই তাকে চাপা যাচ্ছিল না।

পাঁচ বছর রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়ে একদিন ধরাধরি করে যারা আমাকে সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, তাদের ঠাঁই ছিল ঘর আর রাস্তার মাঝখানে। শহরের শেষ প্রান্তে এক খোলার বস্তিতে। গৃহস্থ পতিদেবতারাই ছিল তাদের প্রধান খদ্দের।

দেবস্থান থেকে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে সরতে সরতে কিভাবে যে আমি প্রমীলা রাজ্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলাম জানি না। জ্বরের ঘোরের মধ্যে হঠাৎ আমার মুখে জল ঢেলে দিতে দেখেছিলাম রাস্তার মোড়ে বসা কপালে লাল টিপ-পরা এক মাঝবয়সী পানওয়ালীকে।

আমার ফোলা ফোলা হাত-পা মুখ আর কানের পাতা তার চোখ এড়ায় নি। জ্বরের তাড়স কমে এলে আমাকে সে নিয়ে গিয়ে তুলছিল তার দাওয়ায়।

তখনকার মত ভালো হয়ে ওঠার পর আমাকে সে তার জীবনের কথা

বলেছিল। তার স্বামী ছিল ছুতোরমিস্ত্রী। খুব সচ্ছল সংসার। প্রথম সন্তান হওয়ার পরই তার কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ে। হাসপাতালে যায়। তারপর রোগ যখন তার একেবারে সেরে গেল, তখন শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ি কোথাও আর তার ঠাঁই হল না। এমনি করে পাঁচ দুয়োরে ঠোক্কর খেতে খেতে একদিন সে এসে ঠেকেছিল এই খোলার বস্তিতে।

আমার ওপর মেয়েগুলোর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম, আমি না হয়ে একটা ঘেয়ো নেড়ি কুকুর হলেও ওদের সেটা হত। আসলে করুণা করার মত কাউকে পেলে ওরা যেন বেঁচে যায়। ওদের একজন কোন্ এক সাধুবাবাকে ধরে আমার হাতে একটা মন্ত্রসিদ্ধ মাদুলি বেঁধে দিয়েছিল। তার আগেই অলৌকিকের ওপর আমার আস্থায় চিড় ধরেছিল। আস্তে আস্তে আমি বুঝছিলাম আমার গলায় নিয়তির ফাঁস ক্রমেই এঁটে বসছে। উপলব্ধিটা আমার ভেতর থেকে আসছিল। তবু আমি হাসিমুখেই মাদুলিটা ধারণ করেছিলাম।

ফোলা ফোলা ভাব কমে গিয়ে আমি ভালো হয়ে উঠলাম। তাই দেখে ওরা কয়েকজন ঠাকুরের কাছে পুজো দিয়ে এল।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে প্রথমে দমকা হাওয়া, তারপর মুষলধারে বৃষ্টি। দেয়ালের কোণে পিঠ দিয়ে কুঁক্‌ড়ে মুক্‌ড়ে বসে আমি ভাবছি ঃ আর নয়, যত তাড়াতাড়ি পারি আমাকে পালাতে হবে। কী একটা বন্ধনে ভেতরে ভেতরে আমি জড়িয়ে পড়ছি।

রাত গড়িয়ে যায়। বৃষ্টি ছাড়ার কোনো লক্ষণই নেই। জানালাগুলো বন্ধ ব'লে কারো ঘর থেকেই আলো এসে না পড়ায় চাতালটাতে দুর্ধর্ষ অন্ধকার।

এলোমেলো হাওয়ায় থেকে থেকে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে। বৃষ্টির প্রত্যেকটা ফোঁটা দিয়ে আমি নিজেকে বাঁধছিলাম। টুং টাং ক'রে লোকে যেমন কান খাড়া করে সেতারের তার বাঁধে।

গোঁফ আর দাড়ি দিয়ে মুখের ছাঁদটাকে পাল্টে দেওয়া ছাড়াও এই ক'বছরে আমি অসম্ভব বদলে গিয়েছি। পুরনো লোকেরা দেখলেও আজ আমাকে চিনতে পারবে না। মজ্জাগত অভ্যেসগুলোকে যেন গায়ে বসা পোকার মত টোকা দিয়ে আমি সরিয়ে দিয়েছি।

আরেকটা কথা, যা নিজের কাছেও স্বীকার করতে বাধে, তা হল এই যে—বেঁচে থাকার প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার মনোরসনায় সমানে যেন মধু ক্ষরণ করতে থাকে। আনন্দ আর বেদনার মধ্যে, সুখ আর দুঃখের মধ্যে আমার কোনো ফারাক নেই।

স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় গুটিয়ে বসে থাকলেও আস্তে আস্তে একটা সিরসিরে

ভাব আমার পায়ের দিক থেকে উঠে আসছে। থমথমে রাত্তির, থেকে থেকে হাওয়ার ফিসফাস আর টিনের চাল থেকে সমানে বৃষ্টির জল গড়িয়ে শানবাঁধানো উঠোনে পড়ার শব্দ—চোখ বন্ধ ক'রে আমি কান দিয়ে আস্বাদন করছি। সেই সঙ্গে শরীরে একটা কাঁপুনির ভাব।

খুট ক'রে একটা শব্দ হয়েছিল শুনেছিলাম।

খানিকক্ষণ পর একটা হাত এসে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

ভেতরে যেতে গিয়ে বুঝলাম আমার হাঁটুতে জোর নেই, দাঁতে দাঁত লেগে গিয়ে আমি ঠকঠক ক'রে কাঁপছি। বিছানায় ঢলে পড়ার পর আমার সারা শরীর জুড়ে নেমে আসছিল একটা করে কাঁপুনির ঢল আর ঢেউয়ের মত একটা আচ্ছন্নতা। আমি তার মধ্যেও থেকে থেকে অনুভব করছিলাম এক নারীদেহ তার উত্তাপ দিয়ে সমানে চেষ্টা করে চলেছে আমার কাঁপুনিটা বন্ধ করতে।

তারপর কি হয়েছিল জানি না। চোখ খুলে দেখেছিলাম শুয়ে আছি প্রকাণ্ড এক হাসপাতালের বারান্দায়।

তারপর সেখান থেকে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বহুদূরের এই কুষ্ঠ-হাসপাতালে।

কেউ যেন মনে না করেন, আমি আমার জীবনকাহিনী লিখতে বসেছি। আমি কে যে অন্যকে আমার জীবনবৃত্তান্ত শোনাব?

তবু কেন আমি কলম হাতে নিয়েছি, সেটা ছোট্ট ক'রে আগেভাগে ব'লে নিলে ভালো হত। কিন্তু কেমন ক'রে বলতে হয়, তাও তো জানি না অনুবাদক হল সুবোধ বালক। কোনোরকম গাঁইগুঁই করা তার সাজে না। কিন্তু লেখক যেখানে আত্মপরিচয়হীন, আর অনুবাদের নির্ভর যেখানে অগোছালো পাণ্ডুলিপি, সেখানে অনুবাদকের অবস্থাটা হয় খালি পায়ে গরম বালির ওপর দাঁড়ানোর মতন। কেউ যদি জিগ্যেস করে, নিজে সেধে এ দায় ঘাড়ে নিতেই বা গেলে কেন? তার উত্তরে আমার চুপ ক'রে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমি এমন এক গণ্ডীর মধ্যে মানুষ যে, তার বাইরেটা আমার অনন্ত কৌতূহলের বিষয়। সেখান থেকে কারো এতটুকু গলা পেলেই আমার কান খাড়া হয়ে ওঠে। খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে ক'রে সব কিছু আমার জানতে ইচ্ছে করে। শুধু যাওয়া নয়—হোঁচট খাওয়া, হাঁটতে হাঁটতে পা ভারী হয়ে আসা, হাঁটু টনটন করা, আমি চাই প্রত্যেকটা অনুভূতি যেন আমার হয়। কিন্তু অনুবাদে নিজেকে ধরে রাখতে হয়; যতটুকু দেওয়া আছে শুধু সেইটুকু নিয়েই খুশী থাকতে হবে—একটু কম নয়, একটু বেশিও নয়। ইংরিজিতে এক ধরনের লেখা আছে যাকে বলে 'গোস্ট রাইটিং'। যার নামে বই, সে লেখে না; লেখে অন্য কেউ। মান্ধাতার আমল থেকেই এ জিনিস চলে আসছে। রাজা-বাদ্‌শারা টাকা দিয়ে

লোক রাখতেন নিজেদের কথাগুলো লিখিয়ে নেওয়ার জন্যে। তার মানে এ নয় যে, সেসব বইয়ের সব কৃতিত্ব পেশাদার লিখিয়েদের। কার কৃতিত্ব বেশি, কার কম—এ নিয়ে যত তর্কই থাক, মালমশলা যে যোগায় আমার কাছে তার দামই বেশি। সত্যি বলতে কি, এ বইয়ের অনুবাদক না হয়ে আমি যদি ভুতুরে লেখক হতে পারতাম, তাহলে আমি যে কী খুশী হতাম বলার নয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হত লেখককে যদি আমি আমার নাগালের মধ্যে পেতাম। তার প্রত্যেকটা কথা আমি বাজিয়ে দেখতে পারতাম। যেখানে যে ফাঁক আছে, জেরা ক'রে ক'রে তা ভ'রে নিতে পারতাম। কিন্তু তাতেও কি আমার মুশকিলের সম্পূর্ণ আশান হত ? একই রেখায় দাঁড়িয়েও আমরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা একটা বিন্দু। হাজার চেষ্টা করলেও হুবহু এক হওয়া যায় না। বড়জোর খুব কাছাকাছি কোনো সমান্তরালে আসা যায়। এখানে আমাকে অনুসরণ করতে হচ্ছে এমন একজনকে, হাত বাড়িয়েও যাকে আমি ঠিক ধরতে ছুঁতে পারছি না। আমাকে এগোতে হচ্ছে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। এমন এক অনিচ্ছাকৃত দায়ে আমি জড়িয়ে পড়েছি শেষ না ক'রে যা থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই।

॥ ৪ ॥

হাসপাতালে না এসে পড়লে আমার হাত দুটোকে কিছুতেই আর রক্ষা করা যেত না। বসে যাওয়া নাকের ডগা আর ফোলা-ফোলা কানের জন্যে আমার মুখ যে কী বীভৎস দেখতে হয়েছিল, বলার নয়। সেরে যাওয়ার পরও টালবাহানা ক'রে একটা বছর কোনো রকমে কাটানো গেছে। এরপর রাস্তায় এসে দাঁড়ানো ছাড়া কোনো গত্যন্তর রইল না। রোগমুক্ত হলেও আগের জীবনে কোনোদিনই আর ফিরে যেতে পারব না। আমার এগারো বছরের আত্মনির্বাসন পেছনে শূন্যতার যে দাগ রেখে এসেছিল, সে দাগও হয়ত আজ মিলিয়ে গিয়েছে। সময়ে সব ফাঁকই আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে আসে।

হাসপাতালের গেট থেকে বেরোলাম। হাতে ছোট একটা পুঁটুলি। যেদিন প্রথম বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলাম হাত ছিল খালি। কিন্তু তখন নিজেকে এমন একা ব'লে মনে হয়নি। তখন আমার সামনে গমগম করছিল সারা পৃথিবী। দৈবের কৃপায় কিছু একটা মিলে যাবে। হঠাৎ একদিন জেগে দেখব দুঃস্বপ্নের মত আমার রোগটা মিলিয়ে গেছে। আবার আমি ফিরে পাব সেই পুরনো জীবন। কিন্তু ঠিক আগের মত নয়। ঘরের সঙ্গে বাইরেকে মিলিয়ে আমি তাকে নতুন ক'রে ঢেলে সেজে নেব।

কিন্তু রাস্তায় পা দিয়ে এই প্রথম আমার মনে হল, আমার সামনে এখন কেউ

নেই, কিছু নেই। স্মৃতির দিক থেকে সেই যে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম, তারপর থেকে পুরনো সব মুখ এখন ঝাপসা। মুখের সঙ্গে মুখ জড়িয়ে গিয়ে সব লেপে মুছে যায়।

খানিকটা হাঁটার পর কেমন যেন হাঁফ ধরে গেল। কোথাও যাওয়ার নেই ব'লে আমার যাওয়ার কোনো তাড়াও ছিল না। একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় এসে বসলাম। খোলা মাঠের দিক থেকে বয়ে আসছিল ঝিরঝিরে হাওয়া। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমে চোখ বুঁজে এসেছিল। আগের দিন আকাশপাতাল চিন্তায় সারাটা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

হঠাৎ একদল লোকের পায়ের শব্দে আর ডাকাডাকিতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

আঙুলখসা একটা হাত আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকছে। 'প্যান্‌সাহেব, ও প্যানসাহেব'।

প্যানসাহেব! হ্যাঁ, আমি। হাসপাতালে অন্য রুগীরা ঐ নামেই আমাকে ডাকত।

ঘুমের ঘোর কাটলে তাকিয়ে দেখি বিশ-তিরিশটা লোকের একটা দঙ্গল। সবার কাঁধেই একটা ক'রে ভিক্ষের ঝুলি।

তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আমার চেনা। একই হাসপাতালে আমরা ছিলাম। আমার ছিল একটু আলাদা খাতির। সাহেব ডাক্তার আমাকে একটা লেখবার কলম দিয়েছিলেন। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আমি প্রায়ই একটা লণ্ঠন টেনে নিয়ে টুকটাক লিখতাম। সাহেবের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতাম। তাই থেকে আমার নাম হল পেন্‌সাহেব। লোকে বলত 'প্যানসাহেব'।

আমার কোথাও যাবার ছিল না। ওরা আমার হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চলল। আমি সেই বাতিল মানুষগুলোর হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সঁপে দিলাম।

শুরু হল আমার অন্য এক জীবন। বাড়ি ছাড়ার পর থেকে আমি শুধু ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি। এবার আমি পায়ের নিচে পেলাম থিতু হওয়ার মাটি আর সঙ্গী হিসেবে পেলাম সমান-সমান মানুষ।

একসঙ্গে এত ভাঙাচোরা আর তেড়াবাঁকা মানুষকে আকাশের নিচে মাথা উঁচু ক'রে থাকতে আগে কখনও আমি দেখিনি।

'প্যানসাহেব, প্যানসাহেব' বলে অনেকেই ছুটে এসে আমার হাত ধরল। তারা অনেকেই আমার চেনামুখ। আমি যেন অনেকদিন পর হারানো আপনজনদের মধ্যে এসে পড়েছি।

তালবেতালিয়ায় পা দেবার সেই আমার প্রথম দিন। কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিল এতদিনে আমি আমার নিজের বাসভূমি খুঁজে পেলাম। প্রত্যেকের চোখে চোখ রেখে আমি তাকাতে পারছি। আমাকে দেখেও অন্ধকারে কেউ আঁতকে উঠবে না।

বেশ ক'বছর আগে কিভাবে এখানে এদের এই আস্তানাটা গড়ে উঠেছিল পরে শুনেছি।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা জোটেনি, তারাই মাঠ-রাস্তার ধারে এই প'ড়ো ডাঙা জমিটাতে পাতার ছাউনি বানিয়ে জলরোদে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করে নেয়। আস্তে আস্তে এই জবরদখল জমিতে পত্তন হয়েছে সেরে-যাওয়া কুষ্ঠরোগীদের গাঁ।

এখন মাঠের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পরের পর সারবন্দী ঝুপড়ি।

বসে গল্প করছি, এমন সময় চ্যাংমুড়ি এসে আমাকে ডাকল, 'বেলা হয়েছে। খেতে চলো গো, প্যানসাহেব।'

চ্যাংমুড়িকে আমি বিলক্ষণ চিনতাম। আমাদেরই হাসপাতালে ও ছিল। বছরখানেক আগে ওর ছুটি হয়ে যায়। ডান চোখটা নষ্ট হয়ে গিয়ে তার বাঁ চোখটা কোনো রকমে রক্ষা পায়। রঙ কুচকুচে কালো। আদিবাসীদের মেয়ে। হাসপাতালে গান গেয়ে ছড়া কেটে সবাইকে মাতিয়ে রাখত।

এখানে ওকে দেখে গোড়ায় একটু খট্‌কা লেগেছিল। চ্যাংমুড়িকে স্বামীসোহাগিনী বলেই আমরা জানতাম। ওর স্বামীকে দেখেছি মাঝে মধ্যে আসত স্ত্রীর জন্যে শাড়ি আর বিস্কুটের টিন নিয়ে। তারই মধ্যে এক সময়ে দলিলে টিপছাপ দিয়ে ওর স্ত্রীর নিজস্ব জমিটুকুও সে বাগিয়ে নিয়ে চলে যায়। চ্যাংমুড়ি ফিরে গিয়ে দেখে ঘরে সতীন এসেছে। তার জন্যে গোয়ালঘরে জায়গা হয়েছিল। ঘেন্নায় আর লজ্জায় সেইদিনই সে গাঁ ছেড়ে চলে এসেছিল।

কলাপাতায় গরম ভাত বেড়ে দিয়েছিল চ্যাংমুড়ি। বাড়ি ছেড়ে আসার পর ক্ষিধে পেলে খেয়েছি। কখনও তৃপ্তি পাইনি বলব না। কিন্তু সেটা পেট ভরার তৃপ্তি।

কিন্তু বহুদিন পর এই প্রথম প্রত্যেকটা গ্রাস মুখে নিয়ে খুব তারিয়ে তারিয়ে খেলাম। চ্যাংমুড়ি আগে থেকেই গাছতলায় একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে রেখেছিল।

মাদুরে লম্বা হয়ে আমার সমস্ত মন এক অপরূপ প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

সমাজ থেকে ছেঁটে-ফেলা দাগী মানুষের এই দঙ্গলটাতে এসে আমার মনে হল এই আমার নিজের জায়গা।

তারপর শুরু হল এক নতুন পর্ব।

ভিক্ষেয় বেরিয়ে যে এ জিনিস ঘটবে, প্রথম দিন আমি আগে থেকে ঠিক ঠাহর ক'রে উঠতে পারিনি।

আমি ছিলাম সকলের পেছনে।

সকালের প্রথম রোদে একটা লালচে ভাব থাকে। সেই সঙ্গে গাছের পাতায় পাতায় লেগে রয়েছে লালমাটির ধুলো। দুপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। খুব ভালো লাগছিল দেখতে।

দলটা এমনভাবে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, যেন পুরো রাস্তাটা তাদের কেনা।

সামনে থেকে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে আসছিল ব্যাপারীদের একটা খালি গরুর গাড়ি। হঠাৎ দেখি গাড়িটা রাস্তার একেবারে একপাশে সরে গিয়ে বাঁদিকে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়িতে ব'সে থাকা ব্যাপারীগুলোর নাকমুখ গামছায় ঢাকা। উড়ে আসা ধুলোয় কুষ্ঠরোগের জীবাণু পাছে তাদের শ্বাসনালীতে সেঁধিয়ে যায় এই ভয়ে তারা যেন কাঠ হয়ে আছে।

আমি ছাড়া দলের আর কেউ তাতে বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করল ব'লে মনে হল না। আমি নতুন ব'লেই কেমন যেন ধক ক'রে লাগল।

দাঁড় করানো গাড়িটাকে আমরা আস্তে আস্তে পেরিয়ে গেলাম।

গাড়ির মেঠো রাস্তাটাকে ডানদিকে যেতে দিয়ে খোয়াইয়ের ভেতর দিয়ে আমরা নেমে এলাম পায়ে-চলা সিধে রাস্তায়। তারপর ওপরে উঠতেই দুপাশে শহরের ময়লা ফেলার জায়গা। সেখানে ঘোঁত ঘোঁত ক'রে চরে বেড়াচ্ছে একপাল শুয়োর।

সামনে তাকিয়ে মনে হল এরপর আমরা ডানদিকে যাব। গাছের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে দু-চারটে পুরনো পাকাবাড়ির চুনবালিখসা ইঁটের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমাদের দলটা বেশ একটু চনমনে হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ যারা চুপচাপ ছিল তারাও সরবে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। ফুটন্ত কড়াইয়ের মুখের ঢাকনাটা খুন্তি দিয়ে সরাবার সঙ্গে সঙ্গে যে রকম একটা আওয়াজ হতে থাকে ঠিক সেই রকম।

পায়ে-চলা পথ শেষ হয়েই ডানদিকে শহরের পাকা রাস্তার শুরু।

ঠিক সেই সময় কী যে হল জানি না। সামনের লোকগুলো হুড়মুড় হুড়মুড় ক'রে এগোতে শুরু করে দিল।

যে ক'জনের নাক খসে গিয়ে দাঁতগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সেই গন্নাকাটা, আঙুল-খসা, খোনা লোকগুলো গলা দিয়ে গোঙানোর আওয়াজ বার ক'রে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে এমনভাবে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিল যে আমি তো একেবারে হতভম্ব।

হঠাৎ কানে এল আশপাশে দুড়দাড় ক'রে দরজা-জানলা বন্ধ করার আওয়াজ। ততক্ষণে আমাদের সামনে রাস্তা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। তারপরই আমাদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসতে লাগল ঢিল। গাছ দেয়াল ইঁদারার আড়াল থেকে ঢিল মেরে যারা পালাচ্ছিল, সেই সব বাচ্চা ছেলেদের অনেককেই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

একবার ট্রেনে ক'রে আসছিলাম। কম্পার্টমেণ্টের কিছু লোক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'জানলা বন্ধ করুন, জানলা বন্ধ করুন।' বলতে না বলতে জানলা দিয়ে একটা ঢিল সজোরে এসে লাগল আমার ঠিক পাশে এক বুড়ো ভদ্রলোকের চশমায়। চশমাটা ছিটকে গিয়ে কাঁচ দুটো ভেঙে খান খান হল। বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলে ভাঙা কাঁচ তাঁর চোখে ঢুকে যেতে পারত। তবে তাঁর চোখ এমনিতেই এত খারাপ ছিল যে, বাকি পথ প্রায় অন্ধ হয়েই তাঁকে বসে থাকতে হল।

রেললাইনের ধার থেকে ছেলেদের পাথর ছুঁড়ে মারার কথা আরও অনেকের কাছে শুনেছি।

ছেলেবয়সের এ এক রকমের খেলা। কে কত দূরে ঢিল ছুঁড়তে পারে, কার হাতের কেমন টিপ। কিন্তু শুধু কি তাই?

ঘেয়ো কুকুরকে ইঁট মারার পর যন্ত্রণায় যখন সে কেঁউ কেঁউ ক'রে কাঁদে? নাকি দস্তুরমত লাগাতে পারলে তবেই হাতের সুখ হয়।

ছোটরা সরল ব'লেই কি তাদের নিষ্ঠুরতায় রাখঢাক থাকে না? আত্মপর সম্পর্কটাকে তারা জোরগলায় জাহির করে। নিজেকে জবরদস্তভাবে দাঁড় করাবার জন্যে তারা অন্যদের ঠেকাতে আর মোক্ষম রকম ঘা দিতে চায়।

মানুষ যত বড় হয় আত্মপর ভেদটাকে ছোটবড় কাছে-দূরে নানান মাপে বাঁধে।

সমানতালে চলতে না পারলেও আমি ওদের পেছন পেছন চলেছি। আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেন কোনো বর্গীর দল। হা রে রে রে ব'লে হানা দিয়েছি এক ভিন্‌দেশী রাজত্বে।

ধাঁ ক'রে একটা ঢিল এসে রগে লাগতেই মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লাম। ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে দেখলাম—না, রক্ত বেরোয়নি; জায়গাটা শুধু ডুমুরের মত ফুলে গিয়েছে। কিছু না ভেবেই রাস্তা থেকে চট ক'রে একটা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। ছেলেগুলোর মাথা ফাটিয়ে দেব। মুঠোটা শক্ত হতে হতে তারপর এক সময় আল্‌গা হয়ে গেল। মরণ আমার, কার ওপর রাগ করছিলাম!

তারপর ঠিক পঙ্গপালের মত এ-গলিতে সে-গলিতে আমরা ছড়িয়ে পড়েছিলাম। কয়েকজন কিচ কিচ ক'রে ছুঁচোর মত বিচ্ছিরি শব্দ করছিল খোনা

গলায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে গেলাম এরা সব পাকা লোক। যারা চোখ খামচে জল বার ক'রে ভিক্ষে চায়, তাদের সঙ্গে এদের একফোঁটা মিল নেই। বিকলাঙ্গ বটে, কিন্তু ভাবখানা হল পাইকপেয়াদার। ভিক্ষে নয়, একেবারে যাকে বলে গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায়।

গোড়ায় গোড়ায় গেরস্থরা নাকি ভারি হুজ্জতি করত। ভেতর থেকে হবে-না, হবে-না বলে খেদিয়ে দিত। এমনও হয়েছে যে, ছাদে উঠে গায়ে ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছে।

তখন দিতেই হল দু-চারটে বাড়িতে কয়েক ডোজ ওষুধ। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে একদম টাইট।

পাঁচিলে উঠে দু-চারটে বীভৎস মুখ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ায় বাড়ির বৌ-ঝিরা দাঁতে দাঁত লেগে উঠোনে এমন আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল যে, তারপরই নাকি বাপুবাছা ক'রে ভিক্ষে দেওয়ার ধুম পড়ে গেল।

রাজ্যজয়ের ভঙ্গিতে বিরাট মোটঘাট ঘাড়ে নিয়ে যখন আমরা তালবেতালিয়ায় ফিরলাম তখন আমার অনভ্যস্ত দুটো পা ক্লান্তিতে টলছে।

॥ ৫ ॥

pathagar.net

কেন এ রকম হল জানি না। তবে, আমার স্বভাব বদলে যাচ্ছে। সামনে যে আরেক আমিকে খাড়া করে আমি নিজেকে দেখতাম, কিছুদিন হল সে যেন ছুটি নিয়েছে। নিজের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সব কিছু আবার আমি সটান দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের এটাকে গাঁ বললেও যেন ঠিক পুরো বলা হয় না। আসলে আমরা একটা খুব বড় পরিবার। এক পুরুষে শুরু হয়ে এখন দু পুরুষে এসে ঠেকেছে।

লোকে স্বীকার করুক না করুক—আহা, আমরা মানুষ তো।

এখানে এক সময়ে মা-র কোলে ছেলে দেখে আমার মনে হত ছেলে-পুলেগুলো যেন বাইরে থেকে আনা। কুড়িয়ে এনেছে না চুরি করে এনেছে, কে জানে।

আমার সেই ভুল প্রথম ভেঙেছিল যখন সোনিয়াকে হতে দেখি।

সোনিয়ার মা দুখন্তির দুটো পা আর একটা হাতের প্রায় সব আঙুলই কুষ্ঠ রোগে খেয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মুখটা থেকে গিয়েছিল নিখুঁত।

সোনিয়া হওয়ার পর প্রথম যখন তাকে দেখি, নিজের চোখকেই আমার

বিশ্বাস হচ্ছিল না। যতবার তাকাচ্ছি ততবারই আমার নজর গিয়ে পড়ছিল সোনিয়ার হাত আর পায়ের গোটা গোটা আঙুলের গুচ্ছগুলোর দিকে। অনেক পরে দেখেছিলাম সোনিয়ার মুখ। আনন্দে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

আমাদের এখানে জন্মের ব্যাপারটা একটু অন্য।

চ্যাংমুড়ির ঝুপড়িতে একটা শাঁখ আছে। কারো ঘরে বাচ্চা হলেই হাতে হাতে ঘুরে সেই শাঁখ বাজতে থাকবে। উঠোনে এত ভিড় হবে যে পা ফেলার জায়গা পাওয়া যাবে না। সবাই মিষ্টিমুখ করবে বাতাসা দিয়ে। বারো মাসে কয়েকটা বাচ্চা হলেই আমাদের তেরো পার্বণ উশুল হয়ে যায়।

এটা যে শুধু আনন্দ করার একটা উপলক্ষ তা নয়। এর মধ্যে আছে একটা মহিমার ব্যাপার। ফুরিয়ে যাওয়া, ক্ষয় হয়ে যাওয়ার জায়গায় টিকে থাকা, প্রাণবান করা।

সেই সঙ্গে আশ্চর্য হওয়া।

দুই বিকৃত বিকলাঙ্গের আলিঙ্গনে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আবির্ভাবের চেয়ে রোমাঞ্চকর জিনিস আর কী হতে পারে?

বাইরের জগৎটার সঙ্গে আমাদের বনিবনা নেই। মাঝখানে রয়েছে একটা ঘৃণার বেড়া।

ওরা আস্ত মানুষ আর আমরা ভাঙাচোরা।

pathagar.net

সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষগুলো থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। নইলে আমাদের ভেতরটা সবক্ষণ জ্বলে পুড়ে খাক হত। তাও ঘৃণায় নয়, হিংসেয়। কারো কোনো ভালো আমাদের সহ্যই হত না।

কারো নাক নেই, কারো আঙুল নেই, কারো চোখের পাতা পড়ে না, ঘষটানি লেগে লেগে কারো পায়ে দগ্‌দগে ঘা—এসব হরদম দেখে দেখে গা-সওয়া হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমাদের মনে কোনো তাপ-উত্তাপ হয় না। আমাদের এখানে এটাই প্রত্যাশিত।

একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয়, তবে কি এই বিকলাঙ্গ মানুষগুলোই আমাদের চোখে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে?

আমরা তো আর জন্ম-বিকলাঙ্গ নই। শুয়োরের পেট থেকেও পড়ি নি।

তাছাড়া পেটের শত্রুরা আছে না? অক্ষত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মে তারা আমাদের চম্‌কে দেয়। চোখ কান নাক মুখ হাত পায়ের সামঞ্জস্যগুলো তারা যে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

সৌন্দর্য আর ভালো লাগা—এ দুটো কি পরিপূর্ণভাবে এক? ভালো লাগে না এমন সৌন্দর্যও তো আছে। সুন্দর নয়, তবু ভালো লাগে—এমনও তো হয়।

এই যেমন হাঁড়িচাচা। কী গলা। শুনলে মনে হয় কোরাসে কথা বলছে।

এক সময়ে রেল-ইঞ্জিনে আগওয়ালার কাজ করত। ভাইগুলো ওর ঘরবাড়ি বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু হাতিয়ে নিয়েছে। মায় জরুগরু অবধি।

তবু হাঁড়িচাচা হাসে। ভুরুর জায়গাটা তেলতেলে লোম ওঠা। মুখটা খাবলানো। দাড়ির কোনো ছিরিছাঁদ নেই। সারাক্ষণ নেশায় চুর হয়ে থাকে।

কিন্তু হাসি কী? একেবারে ভুবনভোলানো। এখানকার চোরপাট্টির ওই হল লীডার।

হাঁড়িচাচা কতবার আমাকে বলেছে, 'চলো তোমাকে একদিন মজা দেখিয়ে আনি।'

আমি বলেছি, 'রক্ষে করো। তারপর ধরা পড়ে জেলে যাই আর কি!'

হাঁড়িচাচা একচোট হাসে।

তারপর কাঁধের গামছাটা ঘোমটার মত মাথায় দিয়ে মুখটা বার করে রাখে। চোখ দুটো টকটকে লাল। এমন বিদ্‌ঘুটে বিতিকিচ্ছিরি মুখ, যে কারো ভয়ে পিলে চম্‌কে যাবে।

বলে, 'আমরা তো মড়ারও বাড়া। কে ধরবে, কাকে ধরবে গো।' বলে আবার হাসে।

রেল লাইনে কয়লা কুড়োতে যাওয়া ছেলে-মেয়ের দলটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল হল্লা আসছে।

যাদের জানানো হয় তারা আগেভাগেই সেটা জানে।

রাত থাকতে উঠে চুলো ধরিয়ে দিনের কাজটা সাত সকালেই তারা সেরে রাখে।

চুলো যখন নিবু নিবু তখনই বীরদর্পে লাঠিধারী সেপাইরা গাড়ি থেকে নামে। ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে মেয়েগুলোকে আগে লাঠি উঁচিয়ে ভাগায়। ফাটাফুটো হাঁড়িগুলো আগে থেকেই সাজানো থাকে। দূরে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে সেগুলো ভেঙে সেপাইরা তড়িঘড়ি পালিয়ে বাঁচে।

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে মেয়েরা সব মুখে কাপড়চাপা দিয়ে হাসে।

এ এক খেলা মন্দ নয়। এতে জীবনের একঘেয়েমি তবু খানিকটা ভাঙে।

বিশ্বসুদ্ধু লোক জানে, এ গাঁয়ে চোলাইয়ের রমরমে ব্যবসা।

এ গাঁ খাঁ খাঁ করে দিনের বেলায়। তখন শুধু আমরা আমরা। বাইরের একটিও জনপ্রাণী তখন এ-পথ মাড়ায় না।

দাগী মানুষ বলেই দিনের আলোকে আমাদের কেমন যেন নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। দিনের আলো যেন চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের শরীরের খুঁতগুলো দেখিয়ে দেয়।

pathagar.net

সারাটা দিন আমরা তাই অন্ধকারের প্রতীক্ষা করি। কেননা একমাত্র তখনই আমাদের গা ঢাকা দেবার একটা উপায় হয়।

দিনের বেলায় শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে টুকিয়ে টাকিয়ে যা জোটে, সে নেহাৎই ক্ষুদকুঁড়ো। তাও কী? তার জন্যে ইঁট-পাটকেল খেতে হয়।

রাত্রিই এখানকার অন্নদাতা।

তালবেতালিয়া জমজমাট হয়ে ওঠে সন্ধ্যের পর। ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে বসে মদ আর জুয়োর আড্ডা। সব জায়গাতেই টিমটিমে আলো। কোনো ঝুপড়ি থেকে ভেসে আসবে ঝুমুর গান। কোনো ঘরে আলো জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ ফস্ করে নিভে যাবে। কান পাতলে শোনা যাবে কিছু অস্ফুট জান্তব শব্দ।

কিছু আসে শাঁসালো লোক। মদ-মেয়েমানুষের ধারে-কাছে তারা ঘেঁষে না। তাদের নজর শুধু চোরাই মালের দিকে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দরদস্তুর করে। লেনদেন শেষ করে অন্ধকারেই তারা কেটে পড়ে।

একবার এদের একজনকে খুব জক মেরেছিল ভুতো।

শহরের এক নামকরা পোদ্দার। খুব দাঁওতে সোনার গহনা হাতিয়ে ফিরছিল। হঠাৎ দেখে তার সামনে অন্ধকারে বুকের হাড়পাঁজরা বার করা এক কঙ্কাল এগিয়ে আসছে। গোঁ গোঁ আওয়াজ করে দাঁতে দাঁত লেগে তক্ষুণি সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। সোনার গহনার পুঁটুলিটা ছিটকে গিয়ে পড়েছিল রাস্তার মাঝখানে।

যে টর্চটা পেটের কাছে ধরে ভুতো কঙ্কালের মূর্তি ধারণ করেছিল সেই টর্চের আলোতেই সে পুঁটুলিটা কুড়িয়ে নেয়।

ভুতোকে এর জন্যে হাঁড়িচাচা পরে নাকে খত দেওয়ায়। তাকে কানে হাত দিয়ে বলতে হয় যে, এমন গুখুরি কাজ আর কখনও সে করবে না।

ভুতোকে এই শাস্তি দেওয়ার দরকার ছিল। কেননা ভুতের উপদ্রবের কথা একবার চাউর হয়ে গেলে শহরের সব চেয়ে ডাকাবুকো লোকগুলোও আর সন্ধ্যের পর এমুখো হবে না। কেননা মানুষে তাদের কোনো ভয় ডর নেই। কিন্তু অশরীরীর সঙ্গে লড়াই করবে কার সে বুকের পাটা আছে?

ফলে এই হবে যে, সন্ধ্যের পর তালবেতালিয়ায় আর লোকে আসবে না।

পোদ্দারকে শহরসুদ্ধু লোকে সজ্জন বলে জানে। বাড়িতে ঘটা করে কালীপুজো হয়। তার ওপর আবার এক তান্ত্রিকবাবার শিষ্য। ভূত তাকে ভালো রকমই চোট দিয়েছিল। কিন্তু তালবেতালিয়া কথা মুখে আনা যায় না বলেই দ্বিতীয় কেউ তা জানে নি।

॥ ৬ ॥

কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। আমারও হয়েছে সেই দশা। আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে এখানকার যাবতীয় হিসেবপত্তর রাখার ভার।

অবশ্য স্বর্গ যে এটা নয় তা সবাই বোঝে। শহরের সব ভালো মানুষেরাই জানে, তালবেতালিয়া হল জীবন্ত নরক—দুনিয়ার জাহান্নাম।

হিসেবের খাতাটা ওল্টাতে ওল্টাতে যা দেখছি, আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না।

তালবেতালিয়ায় যেসব চোরাই মাল রাখা হচ্ছে, তার মধ্যে বন্দুক-পিস্তলের ভাগ হুট করে এত বেড়ে যাওয়া ভালো কথা নয়।

একদিন আমরা মনে মনে যতই মৃত্যু কামনা করে থাকি না কেন,এখানে এসে জীবনের মায়ায় আমরা কেমন যেন জড়িয়ে পড়েছি। কারো গায়ে হাত তুলতে আমাদের কষ্ট হয়। কারো কারো তো তুলবার হাতও নেই।

এত মদোমাতাল চোর-জোচ্চোরের আনাগোনা এখানে, কিন্তু মরে গেলেও কেউ-এখানে রাত কাটাবে না। বাইরের সবাই এখানে দিনের বেলায় ভয় পায়। সেই ভয়ের জন্যেই মদ খেলেও মাত্রা ছাড়াতে কারো সাহস হয় না।

তালবেতালিয়ার আকাশের তলায় রয়েছে একটা ভয়ের অদৃশ্য ঘেরাটোপ। রাস্তা থেকে ডাঙায় উঠে আসবার সময় ওদের দেখলে মনে হয় যেন কোনো তাঁবুর মধ্যে ওরা ঢুকছে।

এতদিন হয়ে গেল, অথচ কেউ বলতে পারবে না যে, এখানে খুনোখুনি দূরের কথা, কখনো রক্তারক্তিও হয়েছে।

কেউ চায় না এখানে তার লাশ পড়ুক। কেননা সবাই জানে, এখানে লাশ পড়লে কোনোদিন সে লাশ এর বাইরে যাবে না। কুষ্ঠরুগীদের ছোঁয়া লাশ কোনো মুর্দাফরাশই ছুঁতে রাজী হবে না।

এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল, বাইরের জগৎটাকে একদম ছেঁটে ফেলে দিয়েছি।

পরে সেই মিথ্যেটা আমার কাছে আস্তে আস্তে ধরা পড়ল।

যাকে এতদিন দ্বীপ বলে মনে করে এসেছি, আসলে সেটা অন্তরীপ ছাড়া কিছু নয়।

দুখন্তির মেয়ে সোনিয়া আর বাতাসীর ছেলে পল্টন। ওরা দু'জনেই আমার খুব ন্যাওটা। রোজ সকাল-বিকেল দলবল নিয়ে এসে ওরা আমার ছোট্ট বাগানটাতে জল দেয়।

কাল আমার বাগানে ফুটেছিল প্রথম গোলাপ। সেটা আমি সোনিয়ার হাত দিয়ে চ্যাংমুড়িকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা খোঁপায় গুঁজে সারা সন্ধ্যে খদ্দেরদের ও মন কেড়েছে। তারপর রাত্তিরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে ফুল পেয়ে চ্যাংমুড়ি কত খুশী হয়েছে।

যখন থেকে এখানে গাঁয়ের পত্তন, মোটামুটি তখন থেকেই এখানকার স্ত্রী-পুরুষদের জোড়ায় জোড়ায় বাস। বাপ যেই হোক, তিন বছর অবধি বাচ্চারা থাকে মা-র কাছে। তারপর তাদের আলাদা হয়ে থাকার ব্যবস্থা।

যখন সন্ধ্যে হয়, ওরা ঘুমোবার আগে প্রায়ই ওদের কাছে গিয়ে আমি বসি।

যেদিন কাজ থাকে না, হাঁড়িচাচাও ওদের কাছে গিয়ে বসে। শুরু হয় হাঁড়িচাচার গল্প বলা। আর তার সব গল্পেই থাকে কিছু না কিছু ছড়া।

যেদিন হাঁড়িচাচা থাকে না সেদিন আমি পড়ি মুশকিলে। আমাকে বলতে হয় বানিয়ে বানিয়ে গল্প। আমার মুখের ভাষা শুনে ওরা মজা পায়। কেননা ভাষাটাও যে অনেকখানি বানানো।

তালডাংরায় প্রথম যে জগতের পত্তন হয়েছিল সেটা ভেঙে দুখানা হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আমরা সবাই সেটা বুঝতে পারছি। যাদের দিকে তাকিয়ে সব কিছুর হিসেব হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তারা একেবারেই নড়বড়ে। একেবারেই নশ্বর। তারা আর যাই হোক, কোনো পাকা কিছুর ভিৎ হতে পারে না।

একটা বিষম কাণ্ড ঘটল এই সময়।

দেড় মাসের মধ্যে আধ ডজন খুন হয়ে গেল শহরে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই খুনী নাকি একজন কুষ্ঠরোগী। বীভৎস তার মুখ।

খুনী কুষ্ঠরোগীর কথা প্রথম যখন আমাদের কানে আসে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাহলে তো তালবেতালিয়ারই কেউ হবে।

কিন্তু কে সে?

একটা করে খুনের খবর আসে আর আমরা আড়াল থেকে প্রত্যেকে প্রত্যেককে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

প্রথমেই আমাদের মনের মধ্যে যার মুখ ভেসে উঠেছিল স্বাভাবিকভাবেই সেটা ছিল হাঁড়িচাচার। সে মুখ বীভৎস সন্দেহ নেই। কিন্তু একমাত্র ভয় পাওয়ানো ছাড়া ওমুখে কোনো নৃশংসতা ফোটানো যায়, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। ছ' রাতের মধ্যে দুটো রাত, হ্যাঁ, হাঁড়িচাচা চুরি করতে বেরিয়েছিল। কিন্তু ঐ দুটো দিনই তো খুনের ঘটনা ঘটেছে আটটা-ন'টায়। হাঁড়িচাচা তো তালবেতালিয়া থেকে বারই হয়েছিল মাঝ রাতের পর। মদের আড্ডার অনেকেই তার সাক্ষী।

pathagar.net

তবে কি আর কেউ ?

তালবেতালিয়ায় এতদিন আমরা অবাধে অক্লেশে চলাফেরা করেছি। সকলেরই চালচলনে এখন কেমন একটা আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব। ঘাড় না ফিরিয়েও পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রত্যেকেরই গতিবিধির ওপর কেউ না কেউ নজর রাখছে।

দুটো মাস কিভাবে যে আমাদের কেটেছে বলার নয়।

শেষ পর্যন্ত সেই খুনী লোকটা পাশের এক শহরে পিস্তলসুদ্ধ হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। সেই সঙ্গে এটাও জানা গেল, ও আদৌ কুষ্ঠরোগী নয়। আসলে বাজ পড়ে ওর মুখটা বীভৎসভাবে পুড়ে গিয়েছিল।

থানার লোকেরাই এখানে মদের আড্ডায় এসে খবরটা প্রথম আমাদের দেয়।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এমন একটা ভালো খবরে বুকের পাথরচাপা ভাবটা চকিতে চলে গিয়ে যেখানে আমাদের আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক ছিল, কার্যত দেখা গেল তা হল না। আমাদের দিক থেকে এমনভাবে জেরা করা হতে লাগল যাতে যে কারো মনে হতে পারে যে খবরটার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

এতদিন যে চাপা উত্তেজনায় আমরা সবাই টান টান হয়ে ছিলাম তাতে আস্তে আস্তে ভাঁটা পড়ে এল। কিন্তু পড়ন্ত ভাঁটা সেই সঙ্গে রেখে গেল পাড়ের গায়ে কিছু কাদা।

খুনী প্রকৃতির লোকটাকে কুষ্ঠরোগী বলে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই যে মেনেই নিয়েছিলাম সেটা এখন খুব পরিষ্কার। বিশ্বাসটা খুব দৃঢ় হয়ে বসেছিল বলেই কি আজ সেটাকে ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে? অনেক দিনের একটা পোষা জিনিস খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিলে ফাঁকা তো লাগবেই।

কিন্তু শুধুই কি তাই ?

বাইরের জগৎটার সঙ্গে ভয়তরাসের যে সম্পর্কটা আমরা পাতিয়ে রেখেছি, তার তলায় তলায় কখন কিভাবে যে ঘৃণার বারুদ জমছে আমরা নিজেরাই তা জানি না।

ঠুটো জগন্নাথ। মুরোদ নেই। থাকার মধ্যে শুধু ফুঁ-টুকুই যা আছে। এসব বলেও নিজের মনকে চোখ ঠারা যায় না।

ফি বছরই বর্ষা কালটা আমাদের একটু মুশকিলে কাটে। ডাঙা জমি বলে জল জমে না বটে, কিন্তু জলের ছাঁটে কাঠগুলো প্রায়ই ভিজে যায়। তেমন জল হলে খোলা চুল্লীগুলো জ্বালানোই সম্ভব হয় না। মালেও তখন টান পড়ে। খদ্দেরদের ফেরাতে হয়।

এ বছরটা খরা হওয়ায় আশপাশের আটদশটা গাঁয়ের চাষীদের কপাল

পড়েছে। বেঁচে গিয়েছি আমরা। এবার প্রায় একটানাই চোলাইয়ের কাজ হয়েছে। পুরো ঝক্কিটাই মেয়েদের। এ বছর একদিনও তারা জিরেন পায় নি।

বাইরের লোকদের বলা বারণ। আজ এক মাস হল তিনটি ছোকরা এসে রয়েছে আমাদের গাঁয়ে। পুলিশ ওদের ধরেছিল। মেরে আধ-মরা করে হাসপাতালে পাঠায়। পাহারাঅলার চোখে ধুলো দিয়ে সেখান থেকে ওরা পালায়। পালানো অবস্থাতেই ওরা একদিন তালবেতালিয়ায় এসে ওঠে। এখানে এসে পড়তে পারলে কিছুদিনের জন্যে ওরা যে পুলিশের হাত এড়াতে পারবে, সেটা জেনেই এ জায়গায় ওরা এসেছে।

একজন একটু গোলগাল বেঁটে। অন্য দু'জন লম্বা ছিপছিপে ; লম্বা দু' জনের একজন বেশ ফরসা, অন্যটির চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

কেউই ওরা চোর-ডাকাত নয়। প্রথম দিন দেখেই আমি ধরে ফেলেছিলাম ওরা কোনো রাজনৈতিক দলের।

শহরের একটা পোড়ো বাড়িতে পুরো দু'দিন ওরা লুকিয়ে ছিল। তারপর ধুঁকতে ধুঁকতে কোনো রকমে এখানে এসে পড়ে।

পেট থেকে কথা বার করার জন্যে হাজতে যেভাবে ওদের নখের মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়েছে, দড়িতে পা বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে তারপর পিটিয়েছে, ইলেকট্রিক শক দিয়েছে, শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে এমন নৃশংসভাবে ব্যথা দিয়েছে যে, তার দগদগে চিহ্নগুলো না দেখলে শুধু শুনে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

ওদের শরীরে যন্ত্রণার ঐ দাগগুলোর জন্যেই আমাদের সারা গাঁয়ের লোকের কাছে ওরা আমাদের একেবারে আপন হয়ে গেল।

ছেলেবেলা থেকেই আমার জগৎটা ছিল খুব ছোট্ট। আমি, আমার পরিবার আর দু' চার জন বন্ধু—এর বাইরে পরের ভাল মন্দ নিয়ে ভাবনা কখনও যায় নি। থাকতাম বড় শহরে—ফ্ল্যাটবাড়িতে। পাড়ার ভাবনাও কখনও ভাবতে হয় নি। যারা বক্তৃতায় রাজাউজীর মারে আর ভোট কুড়নির বেশে নিজেরাই পরে রাজাউজীর হয়ে বসে—তাদের প্রতি কখনই আমি খুব টান অনুভব করি নি।

প্রথম সাত দিন ওরা শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোল। হাজতে বাহাত্তর ঘণ্টা ওদের ঠায় জাগিয়ে রাখা হয়েছিল। তারও আগে ওদের গোপন আস্তানা ধরা পড়ে যাওয়ায় গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যেতে হয়। তিন দিন পর অনাহারে অনিদ্রায় এলিয়ে-পড়া অবস্থায় ওদের ছেঁকে তোলে।

ক'দিনের একটানা শুশ্রূষায় আর বলকারক পথ্যে আস্তে আস্তে ওরা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

একটু জোর পেতেই ওরা চলে যাবে-যাবে করছিল।

চ্যাংমুড়ির ধমকানিতে আরও দু সপ্তাহ ওদের থেকে যেতে হল। ও বলেছিল,

গাঁ ছেড়ে রাস্তায় পা দিয়েছ কি পুলিশে খবর চলে যাবে। শুনে ছেলে তিনটি মিষ্টিভাবে হেসেছিল।

ওরা চলে যাবার আগে দুটো সপ্তাহ আমাদের খুব আনন্দে কেটেছিল। দলে যোগ দিয়ে বাড়ি ছাড়ার আগে তিন জনেই ছিল মেডিকেলের ছাত্র।

ফরসা ঢ্যাঙা ছেলেটার ভারি সুন্দর গানের গলা। ছোটদের দুটো স্বদেশি গান শিখিয়ে গেছে। একটা হল 'বাঁচার জন্যে মরতে হলে মরব।' আরেকটা—'দেখ, দেখ, দিন বদ্‌লায়।'

চশমা-পরা ছেলেটা পশুপাখির ডাক নকল করতে পারত ভারি সুন্দর।

বেঁটে গোলগাল ছেলেটা আলোর সামনে হাত রেখে দেয়ালে মজার মজার ছায়ার মূর্তি ফোটাতে পারত।

ছেলে তিনটি আমাদের গোটা গাঁ-টাকে যেন ফাঁকা করে দিয়ে একদিন চলে গেল। আমাদের চোখে জল এসে যাওয়ার কারণও ছিল। এ গাঁয়ের এত বছরের এই জীবনে বাইরে থেকে লোক এসে থাকা এই প্রথম। আমাদের তো আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই—কার এমন ভুতে ধরেছে যে, জীবন্মৃতদের এই ভাগাড়ে অতিথি হয়ে দুটো দিন কাটিয়ে যাবে?

ওরা চলে যাওয়ার পর মনে হল যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে ওরা এসেছিল। নিতান্ত নিরুপায় না হলে ওরাও কি নিজেরা সাধ করে কোনোদিন এখানে আসত?

তাছাড়া ওরা আসায় এটাও আমাদের জানা হয়ে গেল, যে জগৎটাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে আমরা হেদিয়ে মরছি, সেটাও তো খুব একটা থিতু হয়ে নেই। সেখানেও তো কানা পুতের আনা রোগ। নইলে এমন সব সুস্থ স্বাভাবিক সোনার টুকরো ছেলে জান দেবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠবে কেন?

ছেলেগুলোর কথার আড়ে যতটা বুঝেছি তাতে ওরা চায় দুনিয়াটাকে ঢেলে সাজতে। ওপর ওপর ঝাড়পুঁছ করা মানে পুরনো জিনিসটাকে টিকিয়ে রেখে মানুষের যন্ত্রণা বাড়ানো। স্যাকরার ঠুকঠাক দিয়ে হবে না। ওরা দিতে চায় কামারের এক ঘা।

পারে তো ভালো। কিন্তু পারবে কি?

ছেলেগুলো যে বিচ্ছু তাতে সন্দেহ নেই। চলে যাওয়ার আগে ওরা আমাদের মধ্যে থেকে যাওয়ার একটা রাস্তা বানিয়ে রেখে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গলায় এমনভাবে ওরা গান ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ওদের কথা আমরা কিছুতেই চাপা দিতে পারছি না।

জীবনে এই প্রথম আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম।

তাও আবার কার জন্যে? যে আমার চোদ্দ পুরুষের কেউ নেয়, সেই ভুতোর

জন্যে। ওর পা যখন তিনতলার আলসেয় ঠিক সেই সময় গাঁক গাঁক করে তেড়ে আসে এক দাঁতখিচোনো কুকুর। ভয়ে টাল সামলাতে না পেরে বেকায়দায় এমনভাবে ইঁটের ওপর উল্টে পড়ে যে মাথাটা থেঁতলে যায়। ধরাধরি করে আনতে আনতে রাস্তাতেই ভুতো মারা যায়।

কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে হাঁড়িচাচা কেবল বলছিল, আমার ডান হাতটাই চলে গেল।

গর্তের মধ্যে লাশটা ফেলে তার ওপর আস্তে আস্তে মাটি চাপা দেওয়া হল।

দু' মাস আগে যে মেয়েটা ভুতোকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কেঁদে কেঁদে সে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল। তাকে ধরে ধরে নিয়ে গেল সেই লোকটা যার সঙ্গে মেয়েটা এখন আছে।

এখানে এটাই রেওয়াজ। এখানকার কেউ মারা গেলে তার জন্যে খোঁড়া হবে গর্ত। তারপর সেই গর্ত মাটি দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। সাপে কাটলে অনেক জায়গাতেই যেমন জলে ভাসিয়ে দেওয়া নিয়ম। পারলে পুড়িয়ে ফেলা হত। সেটা অনেক দিক দিয়েই ভালো। চোখের আড়াল করার আগে এই পোকায় কাটা শরীরটার শেষ রাখতে নেই। কিন্তু পোড়ানোর যে খরচ অনেক।

এটাই এখানে রেওয়াজ। কে কখন কার সঙ্গে আছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ধরা আর ছাড়াটা এখানে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া আছে স্বভাবের হাতে।

হ্যানসেনের অসুখ ধ্যুৎ, রোগটা হল কুষ্ঠ। আমরা সব কুষ্ঠরোগী। সেরে গিয়েছে তো কী, আমরা যে কুষ্ঠরোগী, সেই কুষ্ঠরোগীই থেকে যাব। চিরজন্মের মত। লুকোবার উপায় নেই, এক নজর দেখলেই লোকে ঠিক ধরে ফেলবে।

পেটে থাকতে যারা মরেছে, তারা হিসেবের বাইরে তো বটেই —পেট থেকে পড়ার পরই যারা মরেছে, তাদেরও আমরা ধরি না। আসলে যেখানে অনেকখানি মাটি তুলে অনেকখানি মাটি ফেলতে হয়েছে, সেই মৃত্যুগুলোই মনের মধ্যে আমরা টিক দিয়ে রাখি। সেদিক থেকে মাথাগুণতিতে ভুতো তৃতীয়।

ভুতোর আগে একজন মরেছে বাচ্চা হতে গিয়ে, একজন সাপে কেটে। বলতে গেলে কিছুই নয়।

একা গাছতলায় বসে হঠাৎ আমার চোখ ফেটে কেন জল বেরিয়ে এল হাজার জেরা করলেও আমি বলতে পারব না।

ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বভাবটা ছিল খুব চাপা। ভেতরে ভেতরে কষ্ট হত খুব, কিন্তু আমার চোখ দেখে কারো বোঝার উপায় থাকত না। বাবা মারা যাওয়ার পর মিনিট পনেরো আমি গুম হয়ে বসেছিলাম। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। তারপর উঠে ছেলের করণীয় যা যা কাজ আমি নিখুঁতভাবে করেছিলাম।

সোনিয়া হলে কী হত জানি না।

কিন্তু ভুতোর সঙ্গে আমার তেমন একটা মাখামাখি সম্পর্কও ছিল না। বরং পোদ্দারকে রাস্তায় ভয় দেখিয়ে গয়নাগাঁটি হস্তগত করার ব্যাপারটাতে আমিই সব চেয়ে বেশি রাগ করেছিলাম।

রাগ হয়েছিল এই কারণে যে, লোভে হোক আর খামখেয়ালে হোক—নিজেকে ও আর সকলের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। ওকে সেটা ভালো করে সমঝে দেওয়া হয়েছিল যাতে সেটা সবার পক্ষেই একটা হুঁশিয়ারি হয়।

হাঁড়িচাচার মুখ দেখে বুঝেছি ভুতোর মৃত্যু আমাদের পক্ষে একটা বড় রকমের ধাক্কা। ভুতো তার ডান হাত ছিল, কারণ কি শুধু এই?

লোকে আমাদের ভয় করে, ঘেন্না করে। এতদিন তারই ওপর আমাদের টিকে থাকা নির্ভর ক'রে এসেছে। কেউ আমাদের ছোঁবে না, এটাই ছিল আমাদের সব চেয়ে বড় বলভরসা।

এই প্রথম আমাদের আত্মবিশ্বাস দারুণভাবে ঘা খেল।

ভুতো কখনও ভাবতে পেরেছিল যে, গেরস্থর হাত ধরে তার সামনে কেউ দাঁড়াবে যে তাকে বাগে পেলে ছোঁবে শুধু নয়—ছিঁড়ে খাবে? এক অমানুষ, যার কাছে গন্ধটা অচেনা হলে সুস্থ সবল ভালো লোকেরও নিস্তার নেই।

ঘুরতে ঘুরতে এক মেলায় একবার একটা যাত্রা দেখেছিলাম। রাস্তায় হানা দিয়েছে দস্যুরা। অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। দেখে আমার কী মন খারাপ হয়েছিল বলার নয়। অর্জুন তাঁর সেই অকেজো গাণ্ডীব পরে যে জলে ফেলে দিলেন, সেটাও নিজের ইচ্ছেতে নয়—অগ্নিদেবের অনেক সাধাসাধিতে।

কাউকে বলিনি। কিন্তু কাল সন্ধ্যে থেকেই আমার মনটা ভারী হয়ে উঠেছিল।

গলাটা একটু ভেজাব বলে বেরোতে গিয়ে দেখি একটা ঝুপড়ির পেছনে আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সোনিয়া। ওর বুকে দুটো স্পষ্ট ঢেউ। চমকে উঠলাম। সোনিয়াও তাহলে বড় হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় নজরে পড়ল ওর পাশে দাঁড়ানো শহর থেকে আসা সেই মস্তান ছোকরাটাকে। ওরা দুজনে কিসব গুজগুজ ফুসফুস করছিল। আমার বুকের ভেতরটা ছাঁত ক'রে উঠল।

নিজেকে যেন সাহস দেবার জন্যেই ডাকলাম, 'কে? সোনিয়া?'

'হ্যাঁ তো।'

'ঘুমোতে যাসনি?'

'না, ঘুম আসছে না।'

কিছু করার নেই। সর্বনাশের পথে পা বাড়াচ্ছে সোনিয়া। কিচ্ছু করার নেই।

এ তো দ্বীপ নয়। একটা অন্তরীপ। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমরা নিজেদের লাগিয়ে রেখেছি। নালাগুলো ওরা এমনভাবে কেটে রেখেছে, যাতে ওদের যত ময়লা জল সব আমাদের দিকেই গড়িয়ে আসে।

সেই যে তিনটে ছেলে বন্দুকের নলের কথা বলেছিল ? যাদের হাতের মুঠোই খোলে না কিংবা যাদের আঙুলগুলোই খসে গেছে—তাদের কথা ভেবে তো আর তারা সেই মোক্ষম দাওয়াই বাতলায়নি।

কারো জন্যে নয়, কোনো কিছুর জন্যে নয়—হঠাৎ আমার দারুণ কান্না পেল। সেদিন চারপাশে কেউ ছিল না বলে জীবনে এই প্রথম, চোখের জল ধ'রে রাখার কোনো চেষ্টাই আমি করিনি।

বড়বাবু প্রথম যেদিন আসেন আমরা সবাই গোড়ায় হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। দূর থেকে শুধু একটা ছাতা, তার তলায় ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়, তাতে রোদ পড়ে ধবধবে দেখাচ্ছিল।

ওঁর মুখ দেখতে পেলাম রাস্তা থেকে ওপরে উঠে আসার পর। সামনাসামনি এলে তবে মুখ আর হাতের খুঁতগুলো ধরা পড়ে। কিন্তু এক সময়ে যে দেখতে সুপুরুষ ছিলেন, এখনও দেখে সেটা আঁচ করা যায়।

আমি ওঁকে পেয়েছিলাম আমার হাসপাতালে আসার গোড়ার দিকে। ওঁর চলায় বলায় ছিল একটা বনেদী ভাব। একটু রাশভারী স্বভাবের মানুষ।

পুরনো জমিদার পরিবার। শহরেও বিষয়সম্পত্তি যথেষ্ট। বাবা পেশায় আইনজীবী হলেও পুরনো কংগ্রেসী। আদর্শের দিক দিয়ে উদারনীতিক এবং গান্ধীবাদী। সুতরাং কুষ্ঠরোগী বড় ছেলেকে বরাবর নিজের পক্ষচ্ছায়ায় রেখেছেন। বরং বড়বাবু বাড়ির আদরযত্ন পেয়েছেন তাঁর অন্য ভাইদের চেয়েও বেশি।

ওঁর রোগটা ছিল একটু কঠিন। শেষ পর্যন্ত আরও ভালো চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকা খরচ করে বাড়ি থেকে ওঁকে দক্ষিণ ভারতে ব্যয়সাধ্য হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে সেরে বাড়ি ফিরেছেন।

একগাল হেসে বললেন, 'বিয়েও করেছি।'

'কী, সেই ভবীকেই।'

'হ্যাঁ। আপনার মনে আছে দেখছি।'

সাহেব ডাক্তার আমাদের ফাদার রিলির কাছে দক্ষিণ ভারত থেকে মাঝে মাঝে ওঁর চিঠি আসত। তাতে বড়বাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের সকলেরই খবর নিতেন।

বেশ কিছুদিন পরে ফাদার একদিন আমাকে শশব্যস্ত হয়ে এসে বললেন,

'আমার ঘরে এসো। একটা দারুণ খবর আছে।'

ঘরে গেলে একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ো'।

দেখি বড়বাবুর চিঠি। তাতে উনি লিখেছেন ঃ ফাদার, তোমাকে এতদিন বলিনি। একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি। অসুখের একেবারে গোড়ায় আমি প্রথম যে হাসপাতালটাতে ছিলাম, সেখানে ওকে আমি প্রথম দেখি। একদিন আমি একটা কবিতা লিখে মেয়েটিকে শোনাতে গিয়েছিলাম। খাটের ওপর ব'সে পা দোলাতে দোলাতে খানিকক্ষণ শুনেছিল। তারপর দুম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল 'বুঝেছি, এখানে সুবিধে হবে না, ভবী ওতে ভুলছে না।' সেদিন আমার পৌরুষে খুব লেগেছিল। মনে মনে বলেছিলাম 'ভবি, একদিন তোমার ঐ দেমাক ভাঙব। কিছুদিন পরেই হাসপাতাল বদল করে তোমাদের ওখানে চলে গেলাম। ওখানে থাকতেই উত্তরের আশা না রেখে আমি ওকে প্রথম চিঠি লিখি। খুব শুক্‌নো ধরনের 'কেমন আছ ভাল-আছি চিঠি।' উত্তর আসে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর আর কী। আস্তে আস্তে চিঠির ভেতর দিয়েই আমরা পরস্পরের কাছাকাছি হই। আমার ঢের আগেই অসুখ ভালো হয়ে গিয়ে হাসপাতাল থেকে ও ছাড়া পায়। আমিও আর দু-চার মাসের মধ্যে বাড়ি ফিরে যেতে পারব। আমাদের দু-বাড়িই বিয়েতে রাজী। আমার ছিল একটাই শর্ত—এ-বিয়েতে কোনো সন্তান হতে পারবে না।

কত বছর পর বড়বাবুকে আবার দেখলাম।

বড়বাবু ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। কতগুলো ঝুপড়ি, কত লোক, বাপ বা মা-র সঙ্গে আসা এবং এখানে জন্মানো ছেলেমেয়ে কত, কতখানি জায়গা—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নিলেন।

যাওয়ার সময় বলে গেলেন দিনকতক পরে আবার উনি আসবেন। হয়ত তখন ভবীকেও সঙ্গে আনবেন।

বেরিয়ে রাস্তা অবধি আমি এগিয়ে দিয়ে এলাম।

বড়বাবুর মাথায় কিছু একটা ঘুরছে তাতে সন্দেহ নেই। ঠিক কী, এখনও তিনি ভাঙেননি। তবে হাবভাবে বোঝা গেছে উনি আমার সাহায্য চান।

কিছুদিন থেকে আমারও মন বলছিল, আর এভাবে চলবে না। আমরা একটা অন্ধ গলিতে এসে ঠেকেছি। এ থেকে বেরোতে না পারলে পোড়াকপাল এই মানুষগুলো শেষ হয়ে যাবে।

এই জায়গাটার ওপর, এখানকার মানুষগুলোর ওপর আমার কেমন যেন একটা মায়া জন্মে গেছে। অথচ ভেবে আশ্চর্য লাগে, এখানকার গাছপালা মাটি জলহাওয়ায় আমি বড় হইনি—এখানকার এই হতভাগ্য মানুষগুলো আমার কেউ নয়। এদের ভাষা মুখে নিয়ে আমি জন্মাই নি। তবু এক অদ্ভুত টানে এদের সঙ্গে

আমি বাঁধা পড়ে গিয়েছি।

এর মধ্যে এখানে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে, যাতে আমি খুবই বিচলিত বোধ করছি।

এখানকার যে ছেলেরা আশপাশের গাঁয়ে দিনমজুরি করে, প্রায়ই দেখা যাচ্ছিল তারা অনেকেই শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে। গাঁয়ে তাদের দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে নেয় এবং এও সত্যি কথা, সাধারণের অর্ধেক মজুরিও তারা পায় না। যত বড় হচ্ছে ততই ওদের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব দানা বাঁধছে, সবাই সেটা লক্ষ্যও করেছে।

দেখে দুঃখ হয়, সব রাগটা ওদের গিয়ে পড়ছে বড়দের ওপর। রাগের কারণটা মিথ্যে নয়। ওরা এ-গাঁয়ের ছেলে না হলে এমন হয়ত হত না। অন্তত ওরা বেঁকে বসতে পারত। গেরস্থদের সঙ্গে দরাদরি করতে পারত। কিন্তু কুষ্ঠরোগীর ঘরে জন্মে ওদের জীবনগুলোও বরবাদ হতে বসেছে।

কাজেই ওদের কাজে ফাঁকি দেওয়া কিংবা কাজে না যেতে চাওয়া—এর মধ্যে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

কিন্তু তার সঙ্গে একটা অন্য উপসর্গ জুটে যাওয়ায় আমাদের সকলেরই একটু গায়ে লাগছে।

মাঝে মধ্যে ওরা পাঁঠা চুরি ক'রে এনে নিজেরা রেঁধে খায়, সেটা ঠিক আছে। ছেলেপুলেরা অমন ক'রেই থাকে। কিন্তু রোজগারের ঘর শূন্য ক'রে সাজসজ্জার বাহার বাড়ে কেমন ক'রে ?

ইদানীং সেটা সকলেরই চোখে লাগছিল।

চিরুনি থাকলেও গাঁয়ে কস্মিনকালে আয়নার চলন ছিল না। কোন্ এক মেলা থেকে পৈলুই প্রথম নিজের জন্যে কিনে এনেছিল আয়না আর দাড়ি কামানোর ক্ষুর। তখন সদ্য তার গোঁফের রেখা উঠেছে। ছোটদের মহলে সেই আয়না নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

তারপর আয়না কেনে সোনিয়া। এইভাবেই, ছোটদের রাজ্যে আস্তে আস্তে এখানে এসব জিনিসের চল হয়েছে।

অর্ধেক দিন বেকার ব'সে থেকে পৈলুর গায়ে অমন সব বাহারে গেঞ্জী জোটে কোথা থেকে ?

একা পৈলু নয়, তার দেখাদেখি আরও কিছু ছেলে।

মুখে স্নো আর ঠোঁটে রং লাগাচ্ছে একা সোনিয়া নয়, আরও কিছু বাড়ন্ত মেয়ে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রঙীন ফিতেয় চুল বাঁধছে আংটি। এরই মধ্যে সে বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে।

pathagar.net

কথাটা আমার কানে তোলে প্রথম চ্যাংমুড়ি—

যে, চোলাই মদের দুটো একটা হাঁড়ি প্রায়ই খোয়া যাচ্ছে।

যে, খদ্দেররা সন্দেহ করছে মদে জল মেশানো হচ্ছে।

তাছাড়া চোরাই মালের হিসেবেও মাঝে মধ্যে গরমিল ঘটছে। এর প্রত্যেকটাই আমাদের সমষ্টির স্বার্থে বড় রকমের আঘাত।

বৃত্তের মধ্যে গজিয়ে উঠছে আরেকটা বৃত্ত। এক সময়ে সেটা পূর্ণ গ্রহণের মত আমাদের ঢেকে দেবে।

ঢেকে দিক। সেটাই আমরা চাই। ছোটরা বড় হয়ে উঠে আস্তে আস্তে আমাদের শূন্য জায়গাগুলো জুড়ে বসবে।

কুষ্ঠ আমাদের কবচকুণ্ডল। কিন্তু আমরা শেষ হয়ে গেলেই এ গাঁয়ের আর তখন সীমান্তের কোনো বালাই থাকবে না। আমাদের সন্তানসন্ততিরা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আজ আমরা ওদের বর্ম। কিন্তু সে আর কতদিন?

একেই তো ভুতোর ব্যাপারটা হাঁড়িচাচাকে ভাবনায় ফেলেছে। গেরস্থরা যদি কুষ্ঠের ভয়ডরহীন কুকুর পোষে তাহলে তো তার চুরির দফা রফা।

খাঁটি জিনিস না পেলে, চোরাই মাল হাওয়া হয়ে গেলে খদ্দেররা মরতে তালবেতালিয়াতেই বা আসতে যাবে কেন?

এক সময়ে পৈলু একটা কুকুরছানা কুড়িয়ে এনেছিল। রাতের অন্ধকারে হাঁড়িচাচা সেটাকে পগারপার ক'রে দিয়ে আসে।

কুকুর থাকলে বাইরের লোকে ভয় পাবে। সেটা ঠিক হবে না। কুষ্ঠের ভয় পাওয়ানোটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সেই ভয়টা ভেঙে গেলে আমরা একেবারেই নাচার।

এখানে হেঁসেলের যত তরিতরকারি, তার সবটাই আসে আমার বাগানটা থেকে। তালবেতালিয়ার সবাই একবার না একবার আসে। দেখে নতুন কী লাগানো হল। বাড়ন্ত সব্জীগুলো ওরা যেন একদৃষ্টে তারিয়ে তারিয়ে দেখে।

প্রথম দিনের কথা মনে আছে। খানিকটা খেলার ছলে শুক্‌নো লঙ্কার কয়েকটা বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ক'দিন পরে দেখি ঠেলে বেরিয়েছে দুটো পাতার একটা ক'রে অঙ্কুর। ব্যস, সেই থেকে নেশা ধরে গেল।

ছেলেবেলা থেকে যাকে গতর খাটানো বলে তেমন কোনো কাজই কখনও করিনি। পায়ে পা দিয়ে বসে থেকেছি। বাড়িতে কুটো ভেঙে কখনও দুখানা করতে হয়নি।

মাথা খাটানোর কাজ, হ্যাঁ, করেছি। কিন্তু যেটুকু ভালো লেগেছে তাও শুধু পড়াশুনোর সময়। জমা খরচের হিসেবের বাইরেটা যতই শুক্‌নো নীরস হোক

তার তলায় থাকে জীবনের ফল্গুধারা। কিন্তু চাকরিতে ঢুকে সংখ্যার সব মজা আস্তে আস্তে উবে গেল। আমার কাজ দাঁড়াল হিসেবের কারচুপি ঘটিয়ে হয়কে নয় করা আর নয়কে হয় করা। গোড়ায় গোড়ায় মন বেঁকে বসত, কিন্তু মোটা মাইনেই শেষ পর্যন্ত আমাকে ভেড়া বানিয়ে ফেলল।

আজ যখন নিজের কথা ভাবি, তখন মনে হয় আগের জীবনে যদি আমি বহাল থাকতাম তাহলে সেটা এর চেয়ে মোটেই বেশি সুখের হত না। একদিন আমার সামনে সুখী জীবনের যে ছবি জ্বলজ্বল করত—হাতে অনেক পয়সা, পাঁচতারা হোটেল, কোম্পানির শোফারসুদ্ধ গাড়ি—এখন সেটা খুব বোকা-বোকা লাগে। এখন আমি বেশ বুঝতে পারি, আরামের জীবনে অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে যায়।

একটা সময় গেছে যখন কিছুতেই নিজের মুখোমুখি হতে পারতাম না। একা পেয়ে পাছে পিছন থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে স্মৃতি। নিজেকে আলাদা ক'রে প্রতি মুহূর্তে চোখে চোখে রেখে আমি তখন স্মৃতির হাত এড়িয়েছিলাম। এখানে আসার পর অনেকের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

আমার পূর্ব পরিচিতরা কেউ এসব কথা বিশ্বাস করবে না, আমি জানি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে খুব অবাক হয়ে গেলাম। এখন কেউ যদি আমাকে সনতারিখ জিগ্‌গেস ক'রে বসে, আমি বেজায় ফাঁপরে পড়ে যাব। তার কারণ এ নয় যে, সময় এখানে স্থির হয়ে আছে। আসলে একটা দিনই আমাদের কাছে সব। তার আগেপরে ব'লে কিছু নেই।

এক সময়ে একদিন কাগজ না পড়লে মনে হত দুনিয়ার বার হয়ে গেলাম।

অসুখ ক'রে সত্যিই যখন দুনিয়ার বার হয়ে গেলাম, তখন আর রোজকার খবরে কোনো রুচি রইল না।

কাল একটা খালি ঠোঙার কাগজে চোখ পড়তেই বুকের মধ্যে ছাঁত ক'রে উঠল। বিশ্বযুদ্ধ এই-লাগে এই-লাগে।

কবেকার কাগজ বোঝবার উপায় নেই। রং হলদে হয়ে আসায় বোঝা যায় বেশ কিছুদিনের পুরনো। তার মানে, মানুষ রসাতলের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

একটা বোতাম টিপলেই তো সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু টেপবার হাতটা তো মানুষের। হয়ত জীবনের ওপর টান থেকে গেছে ব'লেই সে হাতে টান পড়েছে। কিন্তু যার হাত সে যদি মরীয়া হয়?

কাল রাত্তিরে আমাকে রীতিমত ঝাঁকানি দিয়ে তুলে দিয়েছিল চ্যাংমুড়ি। আমায় বুকচাপায় ধরেছিল। ঘেমে নেয়ে উঠেছিল আমার সারা শরীর।

ঘুম ভেঙে মনে পড়ল আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলাম। শহরের লোকগুলো তালবেতালিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা জলের

বালতিগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তাদের হাতগুলো মুঠো করা। জলের বালতিগুলো তুলতে পারছে না।

সেই স্বপ্নের কথা আমি কাউকে বলিনি। কিন্তু সারাদিন মনটা এমন খারাপ হয়ে রইল বলার নয়।

ঘরে আগুন লাগিয়ে পোকা-ধরা দাগী মানুষগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে চাইবে, শহরের মানুষ অতটা আহাম্মক নয়। বরং খোঁয়াড়ে আটক রাখার একটা ব্যবস্থা হলেই তারা খুশি হয়।

আসলে আমার মন খারাপের কারণটা অন্য। ছেলেমেয়েগুলো হাতের মুঠো খুলতে পারছিল না। অথচ আঙুলগুলো তো ওদের অসাড় নয়। তাহলে কি আমাদেরই ছাঁচে নিজেদের ওরা ঢেলে সাজছে? সকাল থেকে এই সন্দেহটা আমার মনের মধ্যে কেবলি খচখচ করছে।

(অনুবাদ কখনও ষোলআনা অনুগত হয় না। এমন কি নিজের লেখা যিনি নিজেই তর্জমা করেন, সে তর্জমাতেও ইতরবিশেষ হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে কোনো ওপরঅলা থাকে না ব'লে তর্জমাকারক বরং একটু বেশিই স্বাধীনতা নেন। পরের লেখা তর্জমা করার সময় যথাসম্ভব পরাধীন হওয়াটাই আমি অবশ্য শ্রেয় ব'লে মনে করি। লেখা উপন্যাস থেকে যখন চলচ্চিত্র সৃষ্টি করা হয়, তখন সেটা ভাষান্তরিত হয় সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে। একই উপন্যাস নিয়ে যখন দুটি পৃথক চলচ্চিত্র তৈরি হয়, তাতে বিস্তর তফাত চোখে পড়ে। এমন কি একই ভাষায় করা দুটি মূলানুগ অনুবাদেও কমবেশি তারতম্য হয়। এত কথার মধ্যে আমাকে যেতেই হত না লেখক যদি সুপরিচিত হতেন এবং এটি যদি পাণ্ডুলিপি না হয়ে একটি প্রকাশিত বই হত। অনুবাদে কোথাও খটকা লাগলে যে কেউ মূল বইটা থেকে মিলিয়ে দেখে নিতে পারতেন। অবশ্য তাতে আমার এলেম ধরা পড়ে যেতে পারত। সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তার উপায় নেই। তর্জমা করার আগে আমি কোনো ঔপন্যাসিক বন্ধুকে দিয়ে আর কিছু না হলেও এর আগাপাশতলা একটু বেঁধেছেঁদে নিতে পারতাম। একজনকে ধরেও ছিলাম। কিন্তু তিনি সব শুনেটুনে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন। বললেন, পরের জিনিসে হাত না দেওয়াই ভালো। কথাটা পরে আমিও ভেবে দেখেছি। কিছু কিছু জিনিস আছে যা নিজের ব'লে ভাবা শক্ত। সেইজন্যেই পরের সব জিনিস নিজের ক'রে নেওয়া যায় না। কে কবে কোথায়—এসব নিয়ে এ লেখক যে রকম নিরাসক্ত, তাতে এঁর মনের গড়নটা বোঝা যায়; কিন্তু পাঠক হিসেবে তো বটেই তর্জমাকার হিসেবেও আমার বেশ খানিকটা অস্বস্তি বোধ হয়। কাউকে

গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার আগে যেমন চোখ বেঁধে দেওয়া হয় এও অনেকটা সেইরকম ব্যবস্থা। হোঁচট খাওয়া ঠোক্কর খাওয়ার ব্যাপারগুলো সেইভাবেই আসে। পরের লেখার মাঝখানে আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমার মাপ না চাওয়াটা অন্যায় হবে। সত্যি বলতে কি, ঠিক কার কাছে কী উদ্দেশ্যে লেখক তাঁর কথাগুলো আমার জবানীতে পৌঁছে দিতে চান আমার কাছে আজও খুব পরিষ্কার নয়। শুধু লেখকের মুখ চেয়ে সেটা বোঝা যাচ্ছে না ব'লেই পাঠকদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে তার ভাবগতিক কিছুটা বুঝে নিতে হবে।)

ক'দিন ধরে মনটা বেশ ভার হয়ে আছে। পর পর এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল যাতে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

একটা ব্যাপার তো কাউকেই আমি বলিনি। এমন কি চ্যাংমুড়িকেও নয়।

খুব ভোরে মাঠ সেরে ফেরার সময় ময়লা ফেলার জায়গায় হঠাৎ আমার নজরে পড়ে রক্তমাখা একটা পুঁটুলি। দেখে কেমন যেন আমার সন্দেহ হল। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু আলাদা।

একটা কাঠি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতেই দেখি চোখমুখের ঈষৎ রেখা ফোটানো একটা মাংসের দলা। একবার ভাবলাম পালিয়ে চলে আসি। রাত সবে ফরসা হচ্ছে। লোকজন এবার উঠে পড়তে আরম্ভ করবে। আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কেউ না কেউ আসবেই।

অথচ এভাবে খোলা জায়গায় জিনিসটা যদি পড়ে থাকে, চিলশকুনে নির্ঘাত টের পাবে। হোক মৃত, হোক অপরিণত—জন্মাতে দিলে তো মানুষই হতে পারত। চোখে পড়েছে যখন, ফেলে পালাই কেমন ক'রে ?

জঞ্জালের ভেতর থেকে একটা শিক কুড়িয়ে নিয়ে ছোট মত একটা গর্ত খুঁড়তে বেশি সময় লাগল না। তারপর আস্তে আস্তে সেটাকে মাটি চাপা দিলাম। একটা বনফুলের চারা তুলে এনে তার ওপর লাগিয়ে দিলাম।

তখন আর ফিরে যাবার তাড়া না থাকায় ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসলাম। ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়া মুখেচোখে এসে লাগছে এতক্ষণে টের পেলাম। দূরে টিলার মাথায় জবাকুসুমের মত লাল সূর্য।

মনের মধ্যে আমার তখন ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে। তালবেতালিয়ায় এমন অঘটন এই প্রথম।

পেটে বাচ্চা এলে ছেঁড়াখোঁড়া মানুষগুলো যেখানে আহলাদে আটখানা হয়, একটা পূর্ণাঙ্গ নবজাতক দেখার জন্যে উঠোনে যেখানে ঠেলাঠেলি ভিড় দাঁড়িয়ে যায়—সেখানে কেউ এমন একটা ব্যাপার করবে ভাবাই যায় না।

গায়ে রোদ লাগতে থাকায় খানিকক্ষণ পর যখন উঠে দাঁড়ালাম, মনে হল বিশ্রী রকমের নোংরায় আমি হাত দিয়েছি। ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি আমায় স্নান ক'রে ফেলতে হবে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ সোনিয়াকে দেখে চম্‌কে উঠলাম।

রোদ প'ড়ে মুখটা ওর কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছে। কখন ও নিঃশব্দে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যই করিনি। চোখেমুখে জল দিয়ে আসার জন্যেই কি ওর চোখের পাতাদুটো ভিজে-ভিজে? চোখাচোখি হতে মুখটা নামিয়ে নিল। ওকি কিছু বলতে চায় আমাকে?

সোনিয়া ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, এই প্রথম সেটা আমার নজরে এল।

আমি সবই বুঝতে পারছিলাম। খুব ইচ্ছে করছিল ওর মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে চুলে বিলি কেটে ছেলেবেলার মত ওকে একটু আদর করার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল আমার হাতদুটো নোংরা। তাছাড়া হাত বাড়ালেও আমাদের দূরত্বটা কিছুতেই আর কমিয়ে আনা যাবে না।

একটু হেসে চলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি জানি আমার পোকায় কাটা ভাঙাচোরা মুখে হাসি ফোটালেও ওর চোখে পড়বে না। ফলে, আমার আর হাসা হল না।

আমার মধ্যে আজকাল একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব এসে যাচ্ছে। আগে আগে সন্ধ্যেবেলায় ভাটিখানায় গিয়ে বসতাম। এখন আর তেমন ইচ্ছে করে না।

শস্তায় মদ-মেয়েমানুষের ধান্ধায় এখানে যারা আসত, তারা কেউ কেউ এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। শহরে বসেই সব কিছু তারা পেয়ে যাচ্ছে। এখন তারা তালবেতালিয়া মাড়ায় না।

যারা এখনও না এসে পারে না, তাদের হাবভাবগুলোও এ ক'বছরে বেশ বদ্‌লে গেছে।

আগে তাদের মধ্যে একটা ভয়ে জড়োসড়ো ভাব থাকত। ঝোলায় করে তারা নিয়ে আসত নিজের নিজের গেলাস। চাটের জিনিসও তারা নিজেরাই সঙ্গে ক'রে আনত।

এখন অনেকেই গেলাস আনতে ভুলে যায়। আংটির মা-র কাছ থেকে নির্বিকারভাবে তারা ভেজা ছোলা আর বাদামভাজা কেনে। নাক-খসা তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের কোনো ভাবান্তর হয় না।

মাতাল আর মাগীবাজের দল আগে সুড়সুড় ক'রে আসত আর সুড় সুড় ক'রে চলে যেত। বেহেড হয়ে হল্লাবাজি করা, বেলেল্লাপনা করা —এসব ছিল না।

সেদিন তো আমার সামনেই এক মাতাল আরেক মাতালকে মারবার জন্যে ছুরি উঁচিয়েছিল। তাকে ধরতেও হয় নি। উঠে দাঁড়িয়ে তার গায়ে আমি হাত

ঠেকাতেই হঠাৎ কেন্নোর মত সে গুটিয়ে গেল। ভয়টা যে একেবারে চলে যায় নি, তবু সেটা একটা আশার কথা।

আগে লোকে ঝুপড়িতে ঢুকত, আলো নিভত আর তারপর ঝটপট বেরিয়ে চলে যেত। আজকাল ঢোকা আর বেরনোর মধ্যে বেশ খানিকটা সময় যাচ্ছে। মেয়েদের কাছ থেকে তারা ঢলাঢলি ফষ্টিনষ্টি এইসব চায়। বলা যায় না, এরপর হয়ত ভালবাসার কথাও উঠবে। গলায় কল্‌সি বেঁধে তখন ডোবা ছাড়া আর পথ থাকবে না।

তালবেতালিয়ার পক্ষে এ সবই খারাপ লক্ষণ।

বড়বাবু তাড়াতাড়ি আসবেন বলে গেলেন, অথচ আজ দুমাস হল তাঁর পাত্তা নেই।

আমি যতটুকু বুঝেছি, বড়বাবু হৃদয়বান লোক। ওঁর স্ত্রীটি কেমন জানি না। তবে পোড়খাওয়া মানুষ সচরাচর ভালোই হয়।

বাড়ির লোক ভালো হওয়াতেই বড়বাবু মরেছেন। জন্মসূত্রের বন্ধন কাটাতে পারেননি। বাবা মান্যগণ্য লোক, শহরের মানুষ তাই বড়বাবুকে খেদাতে পারে নি। কিন্তু বাড়ির মধ্যে অন্তরীণ ক'রে রেখেছে।

ওঁর বাবার যা বিষয়সম্পত্তি আছে তাতে সারা জীবন ওঁকে খাওয়াপরার ভাবনা ভাবতে হবে না।

তবু শহরে উনি একা একঘরে। যাবজ্জীবন এই সাজা থেকে ওঁর রেহাই নেই।

সেবার ওঁর কথার ভাবে মনে হয়েছিল উনি বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে চান। এইখানে? এই তালবেতালিয়ায়? ওঁর পক্ষে সেটা সম্ভব ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।

বড়বাবু আমাদের সমব্যথী, কিন্তু তাই ব'লে তিনি পুরোপুরি আমাদের নন। দু নৌকোয় পা দিয়ে তা হওয়া যায় না।

তালবেতালিয়ায় আমরা রয়েছি, সেও আজ কতদিন হয়ে গেল। আমরা সবাই খরচের খাতা থেকে সেখানে ঠিকরে এসে পড়েছিলাম। ফলে মানুষ থেকে মানুষকে তেমনভাবে আলাদা করার কোনো জো রইল না।

শুধু নিজেরা নিজেরা থাকতে পারলে হত। জীবনের নতুন কোনো ছবি ফোটানো যায় কিনা চেষ্টা ক'রে দেখা যেত। বাইরের সূত্রগুলোই গণ্ডগোলের মূল, নাকি নতুনের মধ্যে কাটছে না পুরনোর সেই জের?

চ্যাংমুড়ির চুলে পাক ধরেছে, কাল রাত্তিরে প্রথম আমার নজরে এল। দেখ কাণ্ড!

তাহলে তো আমার সারা মাথাই সাদা হয়ে যাওয়ার কথা।

বড়বাবু কেন আসতে দেরি করছেন ?

রাত্রে ভালো ঘুম না হওয়ায় উঠেছিলাম বেশ দেরিতে। মাথার কাছে ঢাকা-দেওয়া গেলাসে সকালের চা ছিল। চুমুক দিয়ে দেখি জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

মাঝের পাড়া থেকে একটা হৈচৈয়ের আওয়াজ ভেসে এল।

কী ব্যাপার জেনে আসা দরকার। চিৎকার চেঁচামেচি আগে আমাদের এখানে প্রায় ছিল না বললেই হয়। আজকাল একটুতেই লোকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে।

কাছে যেতেই কানে এল একটা হরবোলা কণ্ঠস্বর। হাঁড়িচাচা চড়া গলায় কাউকে বেদম বকছে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি পৈলুকে নাকে খৎ দেওয়ানো হচ্ছে। ওর ছড়ে-যাওয়া নাক আর ডাক ছেড়ে কান্না দেখে আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা করছিল।

শাস্তির পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাঁড়িচাচা আমাকে তার ঝুপড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে মাদুর পেতে বসাল।

আংটি এসে আমাদের দুজনকে দু গেলাস গরম চা দিয়ে গেল। অনেকদিন পর আংটিকে দেখছি। নিচু হয়ে চা দিতে গিয়ে ও আমাকে বুঝিয়ে দিল পুরনো ফ্রকটা দিয়ে শরীরের অনেক কিছুই ও আর আটাতে পারছে না। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ওর চোখের দুপাশে বাসি কাজল আর ঠোঁটের দুকোণে বাসি রং ধেবড়ে আছে। গালের ওপর দগদগ করছে স্পষ্ট নখের দাগ।

ওর মুখের ওপর থেকে তাড়াতাড়ি আমি আমার চোখ সরিয়ে নিলাম। আংটি তাতে কিছুমাত্র লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল না।

হাঁড়িচাচা তখন গরম চায়ে ঘন ঘন চুমুক দিয়ে রাগ সামলাতে ব্যস্ত। আংটির মুখ দেখে আমার চমকে ওঠা ওর নজরেই পড়ে নি।

ভাঙা কাঁসির গলায় পৈলুর ব্যাপারটা ও আমাকে ভেঙে বলল।

রাত্তিরে পৈলুর পালিয়ে নাইট শোতে সিনেমা যাওয়ার কথা ছোটদের অনেকেই নাকি জানত। বড়দের কাছে ও ধরা পড়ে যায় গান গাইতে গিয়ে। গাইতে বললেই পৈলু এখন সিনেমার গান গায়। তাও আবার নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে।

হলের আলো নিভে গেলে তবে ও সিনেমায় ঢুকত। যাতে তালবেতালিয়ার লোক বলে কেউ ওকে চিনতে না পারে।

আস্তে আস্তে ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অন্ধকারে এবং ছবি দেখার

উত্তেজনার মুহূর্তে পাশের লোকের পকেট মেরে দেওয়াটা কিছুই শক্ত কাজ নয়।

বেশি লোভ করতে গিয়ে ধরাও পড়ে গেল একদিন।

এক চেনা পুলিশ মারমুখো জনতার হাত থেকে ওকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে না গেলে ওকে আর প্রাণ নিয়ে এখানে ফিরে আসতে হত না।

কিন্তু কাল যেটা ঘটেছে সেটা তার চেয়েও একটা ঢের গুরুতর ব্যাপার।

সকালবেলায় হাঁড়িচাচাকে কাঁচা ঘুম থেকে তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৈলু সেই খবরটাই প্রথম দেয়।

থানায় সেদিন বেশ একটা শশব্যস্ত ভাব পৈলুর চোখে পড়ে। অত রাত্তিরেও ছোট-দারোগা বড়-দারোগা খটমট খটমট করে বার বার লোহার গরাদ-দেওয়া ঘরটার দিকে যাচ্ছিলেন আসছিলেন।

ওকে বসিয়ে রেখে পুলিশের লোকটা যেন কোথায় চলে গিয়েছিল। বসে থেকে পৈলুর ঢুলুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ তালা খোলার ঘটাং ঘটাং শব্দে ও খাড়া হয়ে বসে। একটু পরেই দেখতে পায় হাতকড়া-পরা অবস্থায় তিন জন লোককে ওরা বার করে আনছে। দেখে মনে হচ্ছিল ওদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে।

পৈলু একটা মোটা থামের আড়ালে বসে সব দেখতে পাচ্ছিল। ওরা জোরালো আলোটার কাছাকাছি আসতেই পৈলু হঠাৎ শিউরে উঠল। এ তো সেই তিন জন। একজন বেঁটে গোলগাল, একজন ফরসা লম্বা, আরেকজনের চোখে কালো ডাঁটি-দেওয়া চশমা। সেই যারা এক সময়ে তালবেতালিয়ায় গা ঢাকা দিয়ে ছিল। পৈলু আর পল্টন ওদের কাছ থেকেই তো জীবনে প্রথম গান শেখে। স্বদেশী গান।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকার সময় ঠাস করে ওর গালে একটা চড় এসে লাগে। পৈলু তাকিয়ে দেখে সেই চেনা পুলিশটা। গেটের বাইরে হাত দিয়ে দেখিয়ে সে বলল, 'হাঁ করে কী দেখছিস, যা ভাগ—'

বেরিয়ে যেতে যেতে পৈলু দেখতে পায় লোহার জাল-লাগানো পুলিশের একটা কালো গাড়ি গেটের ঠিক মুখটার কাছে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে।

পৈলু যখন খোয়াইয়ের কাছাকাছি এসেছে তখন গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে কালো গাড়িটা সাঁ করে ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ওর কানে আসে সমস্বরে একটা চিৎকার। তার মধ্যে একমাত্র জিন্দাবাদ কথাটাই ও বুঝতে পারে।

গাড়িটা যখন ভাঙা মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে, তখন তার অনেক পেছনে কালভার্টের ওপর থেকে পৈলু কান-ফাটানো গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। ভয় পেয়ে পৈলু শুকনো নালার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। তার অনেকক্ষণ পর গাড়িটা যখন ফেরত আসে পৈলু কারো গলার কোনো আওয়াজ শুনতে পায় নি।

pathagar.net

পৈলুর হাত পা ছড়ে যাওয়ার জন্যে শুধু নয়, গুলির শব্দে ও এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, সকালের আলো ফুটে না ওঠা অব্দি রাস্তায় উঠে আসার ওর সাহস হয় নি।

হাঁড়িচাচাকে যখন পৈলু এসে ডেকে তোলে তখন সব কথা একবারে গুছিয়ে বলার মতন ওর ক্ষমতা ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে জেরা করে করে তবে ওর পেট থেকে সব কথা বার করা হয়।

পৈলুকে দিয়ে নাকে খৎ দেওয়ার পেছনে ব্যথাটা যে ছিল অন্য জায়গায়, হাঁড়িচাচার ছলছলে চোখ আর কাঁপা কাঁপা গলাতেই তা বোঝা গিয়েছিল।

সেদিন তালবেতালিয়ায় সব বাড়িতেই পালন করা হয়েছিল অরন্ধন। ভাটিখানাতে আগুন জ্বলে নি। সন্ধ্যেবেলায় সব খদ্দেরকেই শুকনো মুখে ফিরে যেতে হয়েছিল।

এর হপ্তাখানেক পর একদিন বড়বাবু এসে গেলেন। একা নয়। একেবারে জোড়ে। সঙ্গে প্রায় ওঁর সমবয়সী এক বন্ধু।

কাছে যেতে বড়বাবু পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন—এই হলেন প্যানসাহেব, ইনি আমার ডাক্তার বন্ধু আর এই হলেন ভবী।

ভবী সম্বন্ধে মনে মনে একটা ভয় ছিল না তা নয়। কিন্তু প্রথম দর্শনেই ভবীকে ভালো লেগে গেল। দেখেই বোঝা যায় বেশ খোলামেলা ধরনের মানুষ। চ্যাংমুড়ি, দুখন্তি, বাতাসী—ওদের সবার সঙ্গে ভাব করে নিতে ভবীর এক মিনিটও সময় লাগল না। ডাক্তার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ওঁরা গেলেন পাড়া বেড়াতে।

বড়বাবু চাইছিলেন আমার সঙ্গে একটু একান্তে বসতে। ওঁর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল অনেক কিছু বলবার জন্যে ওঁর ভেতরটা টগবগ করে ফুটছে।

সংক্ষেপে যেটা বললেন তাতে বোঝা গেল, তালবেতালিয়াকে ঢেলে সাজার জন্যে উনি ফেঁদেছেন এক এলাহি ব্যাপার। তালবেতালিয়ার চতুর্গুণ জায়গা নিয়ে গড়ে উঠবে এক নয়াবসত। পুনর্বাসন তো তার একটা দিক। এক পুরুষেই তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। পুরনো লোকগুলো চোখ বুঁজলে আর পাঁচটা গ্রামের মতই এটা হবে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের পত্তন।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—আর পাঁচটা গ্রামের মত?

বড়বাবু সোৎসাহে বলে উঠলেন—অবিকল তাই। অন্য গাঁয়ের সঙ্গে এ গ্রাম একেবারে একাকার হয়ে যাবে।

এতদিন ওঁর না আসার কারণটাও আমাকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন। শুধু তো স্কীম করলেই হল না, দেশকালের এ অবস্থাতেই যে সেটা সম্ভব তা যুক্তি

দিয়ে বোঝাতে হবে। ক্ষমতার আসনে যাঁরা বসে আছেন, আসল কলকাঠিগুলো তো তাঁরাই নাড়বেন। সুতরাং দোরে দোরে ধর্না দেওয়া, সইসাবুদ করানো। শেষ পর্যন্ত সব পর্বই চুকিয়ে ফেলা গেছে।

এখন শুধু দুটো চারটে দিন সবুর করার ব্যাপার।

বড়বাবুর একটা বড় গুণ, ওঁর স্বপ্নগুলো মাটিতে পা দিয়ে চলে। কিন্তু উনি কতকটা ঠুলি-পরানো ঘোড়ার মত, শুধু সামনেটা ছাড়া আশপাশগুলো ওঁর নজরেই পড়ে না।

আমি শুধু হুঁ-হাঁ করে গিয়েছি। কোনো রা কাড়ি নি।

ভবী ফিরে এলেন মাঝের পাড়ায় ডাক্তারকে রেখে। এ গাঁয়ে যেসব রোগবালাই লোকে এতদিন পুষে রেখেছিল, ডাক্তারের সাড়া পেয়ে সব যেন একসঙ্গে খাঁচার মধ্যে পাখা ঝাপটাতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

ভবী এসে পড়ায় আস্তে আস্তে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম।

ওঁরা দেখলাম পুরোনো অনেকেরই খোঁজখবর রাখেন। তার কারণ, একমাত্র ওঁদেরই আছে একটা পাকা ঠিকানা।

'হরতনের টেক্কাকে আপনি তো দেখেন নি, প্যানসাহেব। যখন হাসপাতালে এলেন তখনই তিনি দুটি সন্তানের মা। তাঁর রোগ হয়েছে দেখে কে বলবে? তখনও ফেটে পড়ছে তাঁর রূপ। বনেদী বাড়ির মেয়ে। স্বামী প্রফেসার। টাকাপয়সাও অনেক। ছুটিছাঁটায় নিয়ম করে দেখতে আসতেন। সেই সঙ্গে আসত কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার জিনিস। আর গল্পের বই। তার ভাগ পেতাম ব'লে আমরাও তাঁর আশায় আশায় পথ চেয়ে থাকতাম। এমন স্বামীসোহাগিনী স্ত্রী খুব কম দেখা যায়। স্বামীর লেখা চিঠি ভবীকে পড়ে শুনিয়েছেন। ওঁর নিজের লেখা চিঠিও ভবীকে দু-একবার পড়তে দিয়েছেন। দাম্পত্য প্রেমের সে যেন এক পরাকাষ্ঠা। আমরা ওঁর নাম দিয়েছিলাম হরতনের টেক্কা। উনি প্রায়ই ভবীকে বড়াই ক'রে বলতেন, মরে গেলেও আমাদের মধ্যে কখনও ছাড়াছাড়ি হবে না।' ব'লে বড়বাবু একটু দম নিলেন।

'বছর দুই চলল এইভাবে। হঠাৎ একদিন দেখলাম অমন হাসিখুশি মানুষ, একেবারে মিইয়ে গেছেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না, মুখ খোলেন না। তার কারণ পরে একদিন জানা গেল। ওঁর স্বামী নাকি আবার বিয়ে করবেন ব'লে মনস্থ করেছেন। উনি গোড়ায় বিশ্বাস করেন নি। ওঁর স্বামীও সামনাসামনি এসে আমতা আমতা ক'রে অস্বীকার ক'রে গেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যাওয়ার খবরটা চেপে রাখা যায়নি।'

'এরপর দেখা দিল ভদ্রমহিলার রণরঙ্গিণী মূর্তি। স্ত্রী থাকতে পুনর্বিবাহ অবৈধ—এই যুক্তিতে উনি আদালতে মামলা ঠুকে দিলেন। অনেক টানাহেঁচড়ার

পর একটা আপোষরফা হল। বিয়ের সমস্ত গহনাগাঁটি আদায় ক'রে নিলেন তো বটেই, সেই সঙ্গে হাতিয়ে নিলেন মোটা টাকা খেসারত।' আবার থামলেন বড়বাবু।

'কিন্তু প্যানসাহেব, এর মধ্যে যেটা নতুনত্ব সেটা অন্য জায়গায়। আমার দুঃখ, অজান্তে আমারও তাতে একটু হাত ছিল। হাসপাতালে আমরা তখন একটা হাতে-লেখা ম্যাগাজিন বার করছিলাম। তাতে আমি বেনামে খোলা চিঠির আকারে একটা গল্প লিখি। যেন লক্ষ্মী ব'লে একটি কুষ্ঠরোগী মেয়ে তার পুনর্বিবাহেচ্ছু স্বামীকে চিঠি লিখছে। বিয়ে না করার জন্যে গোড়ায় অনুনয়বিনয়, কাকুতিমিনতি এবং শেষে নিজেকে পরপুরুষের হাতে সঁপে দেবার ভয় দেখিয়ে ঈর্ষ্যা জাগানোর চেষ্টা।

'ও লেখার যে এমন বিষময় ফল হবে, আমি ধারণাও করতে পারি নি। তারপর তো হরতনের টেক্কা একেবারে ভালো হয়ে গিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-দপ্তরে তাঁর একটা কাজেরও ব্যবস্থা হল। তারপর তিনি যা শুরু করলেন সে আর কহতব্য নয়। প্রথমেই তো ওঁর এক ওপরওয়ালাকে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কাছছাড়া ক'রে ফুস্‌লে নিয়ে এলেন, তাঁকে বিয়েও করলেন। কিন্তু তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে পর-ভোলানো ঘর-জ্বালানোর নেশা। ওঁর কাণ্ডকারখানা দেখে ওঁর দ্বিতীয় পক্ষটি নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। ভদ্রমহিলার কপাল বলতে হবে, প্রথম অবস্থাতেই রোগ ধরা পড়ায় দেখে কেউ ধরতেই পারবে না কখনও ওঁর কুষ্ঠ হয়েছিল বলে। ওঁর রূপ থেকে গিয়েছিল অটুট। তারই আগুনে উনি সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন পুরুষ পতঙ্গগুলোকে পুড়িয়ে মারার খেলা। রাগের বশে কোনো ভদ্রঘরের বউ যে নিজেকে এতটা নামিয়ে আনতে পারে ভাবাই যায় না। একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, সমাজে থাকতে গেলে একটু বুঝেসমঝে তো চলতেই হবে। কী, আমি ঠিক বলিনি, প্যানসাহেব?

'তো উনি শুনে কী বললেন, জানেন? বললেন, জুতো মারি আমি সমাজের মুখে। যেমনি ভাষা, তেমনি বলার ভঙ্গি। আজকাল মুখের সামনে আঙুল নেড়ে নেড়ে কথা বলেন। কোনোকালে মাথায় ঘোমটা দেওয়া বাড়ির বউ ছিলেন দেখে কারো বিশ্বাসই হবে না। আমি তো তখন পালাতে পারলে বাঁচি। ওঁর সঙ্গে কথা বলছি কেউ যদি দেখে ফেলে, সেটাও আমার একটা ভয়।

'হরতনের টেক্কার মানসিকতাই এখন হয়ে গেছে পুরুষমানুষ দেখলেই তাকে একহাত নেওয়ার। এরপর উনি যা বললেন, তাতে আমার মনে হল "হে ধরণী, দ্বিধা হও" অবস্থা। আমাকে আরও দেরি করিয়ে দিয়ে যেন লোকচক্ষে হেয় করার আনন্দ পাওয়ার জন্যেই উনি ওঁর ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার ক'রে বললেন, আমার একটা উপকার করবেন, বড়বাবু? আমি জানি, আপনি

খুব সচ্চরিত্র সাধুপুরুষ। তবু ঐ দোকানটা থেকে আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই যদি কিনে এনে দেন, তাতে মহাভারত নিশ্চয় খুব একটা অশুদ্ধ হয়ে যাবে না ?

'বুঝে দেখুন, আমার তখন অবস্থাটা।'

আমি বললাম, 'আপনি নিশ্চয় ওঁর ঐ উপকারটুকু করলেন

'না ক'রে উপায় কী, বলুন ? তবু ভালো, আমাকে উনি মদের বোতল কিনে আনতে বলেননি। অমন মেয়েমানুষের পক্ষে সেও সম্ভব। এরপর আমি ঠিক করেছি—নাকে-কানে খৎ, আর আমি হরতনের টেক্কার হাওয়াবাতাসে থাকছি না। নাকি বলেন, প্যানসাহেব ?'

তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে আমি বললাম, 'দাঁড়ান, আমি একবার দেখে আসি ডাক্তারবাবুর কী হাল হল।'

মাঝের পাড়ায় ডাক্তারবাবুকে একা ফেলে রেখে আসার জন্যে মনে মনে সত্যিই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়ার মতই ডাক্তার দেখলেই রোগের উপসর্গগুলো হঠাৎ চাগিয়ে ওঠে।

যেতে যেতে ভাবছিলাম, বড়বাবু তালবেতালিয়ায় আসবার জন্যে হেদিয়ে উঠেছেন। কিন্তু এলে যে ওঁর হাড়ে দুর্বো গজাবে সেটা উনি টের পাচ্ছেন না। দাগী ব'লে সমাজ যাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আবার তাদের আ-তু ব'লে ডেকে নিলেই বড়বাবুর স্বপ্ন সার্থক হয়। তারপর আজ হোক কাল হোক ভয়ের পাঁচিলটা ধ্বসে গেলেই তালবেতালিয়ার সঙ্গে বাইরের সব তফাত ঘুচে যাবে।

কাছে আসতেই একটা জোর হাততালির শব্দ কানে এল। ডাক্তারবাবু কি বক্তৃতা দিচ্ছেন ?

এগোতেই দেখি বেশ একটা ভিড় জমে গেছে। ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম ডাক্তারবাবুর গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো। ডান হাতে উঁচু ক'রে ধরে রয়েছেন এক বাণ্ডিল তাস।

তাস ? চোখটা মট্‌কে নিলাম। ঠিক দেখছি তো ?

না, সত্যিই তো, তাস ! এক মিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝে গেলাম। ডাক্তারবাবু ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। তাসের হাতসাফাই।

রোগের সব উপসর্গ ভুলে গিয়ে আবালবৃদ্ধ সবাই অবাক হয়ে দেখছে।

হঠাৎ আমার মনে হল ডাক্তারবাবুই আসল লোক। আমাদের এই তালবেতালিয়ার জন্যে একজন ম্যাজিসিয়ানেরই বিশেষ দরকার, যে তার জাদুদণ্ড বুলিয়ে নয়কে হয় আর রাতকে দিন বানিয়ে দিতে পারবে।

সেদিন রাত্তিরে আমি অনেকক্ষণ আধো ঘুমে আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছিলাম।

ভেসে উঠছিল একটার পর একটা ছবি। মাথামুণ্ডু নেই এমন সব জোড়াতালি দেওয়া ছবি।

একটা রেলের লাইন। লোহার রেল। কিন্তু তাকিয়ে থাকলেই ঠিক কেঁচোর মতন হয়ে গিয়ে কেমন যেন নড়ে চড়ে যাচ্ছে। তার দুদিকে দুটো পায়ে-চলার রাস্তা। একদিক দিয়ে একটা মাজা-ভাঙা লোক গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে, আরেকদিক দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে চলেছে একজন আধবুড়ো। আমাদের হাসপাতালের গেট ফুঁড়ে আচমকা সিটি দিতে দিতে একটা দৈত্যকায় ট্রেন একরাশ মেঘের মধ্যে হুশ ক'রে মিলিয়ে গেল। খোলা গেট দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে ঢুকে যেতে দেখা গেল সেই আধবুড়ো লোকটাকে। তারপর আবার সেই রেলের লাইন। তার পাশে গড়ানো জমিতে একটা কাটা মুণ্ডু মাতালের মত টলতে টলতে গড়খাইয়ের জলে ঝুপ ক'রে তলিয়ে গেল।

ঘুম ভেঙে যেতে দেখি গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢক ঢক ক'রে খানিকটা জল খেয়ে নিলাম।

তারপর চোখ বুঁজে আসতেই আবার সেই আবোলতাবোল ছবি। রেলপুলের ওপরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সামনেই বলনাচের ইস্কুল। জানলার ভেতর দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় বেঁকেচুরে একজনের মধ্যে আরেকজনের মিশে যাওয়া দেখছি। আমার পা ধরে টানতেই দেখি রাস্তার ওপর মজুরের পোশাক-পরা একটা লোক—সে একটা লাইটারের আগুনে প্রথমে পায়ের আঙুল, তারপর তার হাতের আঙুল জ্বালিয়ে দিচ্ছে। লোকটা কখনও হিহি, কখনও হোহো ক'রে হাসছে আর ওর সামনে রাখা থালায় ঝনাঝন করে কখনও সিকি আধুলি টাকা, কখনও কাগজের নোট এসে পড়ছে। হঠাৎ রেল-ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় সেটা ঢাকা পড়ে গিয়ে দেখি তার বদলে মুখে হাসি ফোটানো মজার একটা মুখোস প'রে সিংহলের একজন লোক হোটেলের লবিতে নাচ জুড়ে দিয়েছে।

সারা রাত এইভাবেই গেল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে আবার আমার বেলা হল।

রাত্তিরে আমার ঘুম না হওয়া চ্যাংমুড়ি নিশ্চয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে। গেলাসে ঢাকা দিয়ে চা ঠাণ্ডা করার বদলে একটু পরেই গরম ধোঁয়া ওঠা চা এনে সে হাজির হল।

চ্যাংমুড়ির একটা চোখ নেই। মুখটা ঠিক রিলিফ ম্যাপের মত দগদগে। ওর মুখে কোনো ভাবান্তর হলে বাইরের লোকের সাধ্যি নেই বোঝে।

সত্যি বলতে কি, মানুষের দেহ জিনিসটা এক ভারি আজব কল। এর

প্রত্যেকটা নাট-বল্টুতে কত যে বিস্ময় আঁটা থাকে বলার নয়।

চ্যাংমুড়ি ঘরে ঢোকার সময় আমি ওর পায়ের শব্দ পেয়েছিলাম। ওকে না দেখেও আমি স্পষ্ট ধরতে পারছিলাম যে, ওর একটা সুখবর আছে।

আমি পিঠ ফিরিয়ে থাকলেও চ্যাংমুড়ি নিশ্চয় বুঝেছিল আমার মনটা এলোমেলো হয়ে আছে।

চায়ের গেলাসটা নামিয়ে রেখে চ্যাংমুড়ি চলে যাচ্ছিল। আমি ওকে ডাকলাম। 'তুমি কি কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। বলছিলাম কি, আমার এবার শাঁখ বাজাবার একজন লোকের দরকার হবে।'

'সত্যি?'

চ্যাংমুড়ি মুখ নিচু ক'রে রইল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওকে কোলের মধ্যে নিলাম। মরা ডালে ফুল ফোটার আনন্দে ওর গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ক'দিন পর ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বড়বাবু আবার এসে হাজির।

বললেন, 'সোজা আঙুলে ঘি উঠছে না। এদিকে বর্ষা এসে গেলে হবে মুশকিলের একশেষ। তাই ডাক্তারবাবু একটা ওষুধ বাতলেছেন। তাতে কাজ হতে পারে।'

সেই এক ডোজ ওষুধেই হল আশ্চর্য ফল।

শহরের লোক একদিন আঁতকে উঠে দেখল ছ'শো লোকের একটা মিছিল শহরে ঢুকছে। তাদের হাতে ভিক্ষের ঝুলির বদলে পুনর্বাসনের দাবি জানানো প্ল্যাকার্ড। যাদের চলবার ক্ষমতা আছে তারা সব হেঁটে চলেছে। কিছু লোক হাঁটছে লাঠি কিংবা ক্রাচে ভর দিয়ে। পঙ্গুদের জন্যে রয়েছে চাকা-লাগানো প্যাকিং বাক্স। তাতে দড়ি লাগিয়ে পৈলু, পল্টন, আংটি, সোনিয়া আর তাদের দলবল সেগুলো টেনে নিয়ে চলেছে।

শহরে সেদিন ধুন্ধুমার কাণ্ড।

জেলার হাকিম, পুলিসের বড়কর্তা, গদিনশীন দলের চাঁই সব পড়ি-মরি ক'রে ছুটে এলেন।

বিকেলের মধ্যেই দলিল পাকা হয়ে গেল। চোং ফুঁকে সে খবর সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল।

সন্ধ্যেবেলা তালবেতালিয়ায় মদের ফোয়ারা বয়ে গেল। বাইরের কোনো লোক সেরাত্রে তালবেতালিয়ামুখো হয়নি। বড়বাবু আসেননি, ভালো হয়েছে। এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখলে ওঁর পিলে চম্‌কে যেত।

জমি জরিপ, খুঁটি পোঁতা, কাগজে নক্সা ফোটানো এ সব কাজ শেষ। ফাঁকা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে তার ভেতর হচ্ছে ভাঙা ঝুপড়ির লোকদের সাময়িক আস্তানা। ঝুপ্‌ড়ির বদলে তৈরি হবে কয়েকটা ব্যারাকবাড়ি। ভাঙা হবে ভাগে ভাগে।

বড়বাবু সস্ত্রীক চলে এসেছেন তালবেতালিয়ায়। ওঁরা আছেন ছোট একটা তাঁবুতে।

কী দিনে কী রাতে তালবেতালিয়াকে এখন চেনাই যায় না। ভোরবেলা থেকেই রাস্তা দিয়ে শুরু হয়ে যায় মাল-লরির আনাগোনা। সারা তল্লাট জুড়ে অষ্টপ্রহর গোঁ গোঁ, গরর্ গরর্, প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ।

সন্ধ্যে হলে হ্যাজাক বাতির ছড়াছড়ি। রাতটা হয়ে যায় দিনের মত।

বাইরে থেকে এ-গাঁয়ে সন্ধ্যের পর লোক আসা একদম বন্ধ। বাইরে খোলা পড়ে থাকছে দামী দামী জিনিস।

হাঁড়িচাচার চোরপাট্টির হয়েছে এখন নতুন কাজ। রাত জেগে মালপত্র পাহারা দেওয়ার।

পৈলু-পল্টনদের চৌপহর দম ফেলার সময় নেই। ওরা হয়েছে মিস্ত্রিদের যোগানদার।

বাড়ি থেকে পা-কল আনিয়ে নিয়েছেন ভবী। চ্যাংমুড়ি, বাতাসী, আংটি, সোনিয়া—সবাই উঠে প'ড়ে লেগে গিয়েছে সেলাই শিখতে।

ক্রাচে-ভর-দেওয়া পাকাচুল হাজী সাহেব দিনের বেলা এখন আর নেশা করেন না। বড়বাবুর কথায় গাছতলায় বসে গেছে হাজী মাস্টেরের পাঠশালা। ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও মাঝে মধ্যে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ে যাচ্ছে।

সত্যি বলতে কি, তালবেতালিয়ার জীবনে এমন একটা একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল বলার নয়। মরচে-পড়া একটা ভোঁতা ভাব সব কিছু জুড়ে বসেছিল।

আমার বাগানটাকে তছনছ ক'রে দিয়ে উঁচু উঁচু পিলার উঠছে। তার মাথায় বসছে জলের ট্যাঙ্ক।

গোড়ায় কষ্ট হয়েছিল বৈকি। কিন্তু মন থেকে এখন সেটা ঝেড়ে ফেলেছি। বড়বাবু আমাকেও কাজের মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে যেভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন তাতে ওসব নিয়ে মন খুঁত খুঁত করার সময় নেই।

এ ক'দিনের মধ্যে তালবেতালিয়া জবর বদলে গেছে। এখন আর চায়ের লিকারে দুধ পড়ার মত ক'রে নিঃশব্দে সকাল হয় না। এখন ভটর ভটর শব্দে রীতিমত হাঁকডাকের মধ্যে সকাল হচ্ছে।

যারা কাজের মধ্যে আছে, তারা তো বটেই—এমন কি অকর্মণ্য পঙ্গু লোকগুলোও সারাটা দিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে সারা গাঁ টহল দেয়। যে কাজ

করতে দশ জন জোয়ানমদ্দ লোকের জিভ বেরিয়ে যায়, সে কাজ কত অনায়াসে হাসিল হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্রে—দেখে তারা তাজ্জব হয়।

এখানে যে ডিস্পেন্সারি হবে, তার জন্যে ডাক্তারবাবু পৈলু আর সোনিয়াকে বেছেচেন। ওদের তালিম দেবার আগে আমাকে ভার দিয়েছেন ইংরিজি অক্ষর পরিচয় করানোর।

ডাক্তারবাবুর অনুরোধ ঠেলি কী ক'রে ? নইলে মাস্টারির কথায় এমনিতে গায়ে জ্বর আসে। তাছাড়া এখানে তো দরকার গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার। আমাকে দিয়ে সে কাজ হবে কি ? আমার সন্দেহ আছে।

ওদের ওপর এখনই একটা কাজের ভার চাপিয়ে গেছেন ডাক্তারবাবু। যাদের ঘেয়ো পা, তাদের প্রত্যেকের পায়ের মাপ নেওয়া এবং সেই মাপ থেকে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা জুতো তৈরি হবে। যাতে ঘষটানি লেগে পায়ে ঘা তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা ঠেকানো যায়।

এখানে যে ক'জনের চোখের পাতা পড়ত না, তারা এরই মধ্যে পেয়ে গেছে কালো চশমা। চোখে ধুলোবালি উড়ে এসে পড়ার হাত থেকে তারা বাঁচবে।

আজ সকালে হাঁড়িচাচা এসেছিল। চোখ-ঢাকা কালো চশমায় তাকে দেখাচ্ছেও ভালো। অভ্যেস নেই বলে চশমাটা এখনও ওর বাধো-বাধো ঠেকছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তো দেখলাম বার দুই খুলে ফেলল। দুবারই দেখে মনে হল, ওর চোখ এখন আর অতটা টকটকে লাল হয়ে নেই।

ও, একটা কথা বলা হয়নি।

অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে এ-গাঁয়ে যে জিনিসটা এখন সর্বময় হয়ে উঠেছে, সেটা চ্যাংমুড়ির ভাষায় 'একটা সময়-ধরার কল'।

বড়বাবুর মালপত্রের ল্যাজ ধরেই এখানে ওটা এসেছে। ওঁদের বাড়ির পুরনো প্রকাণ্ড একটা দেয়ালঘড়ি। যটা বাজবে ঠিক ততবার ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা পড়ার শব্দ হবে। তারপর আধঘণ্টা হলে ঢং ক'রে একটা আওয়াজ।

মাঝের পাড়ায় ওপরে টিন দিয়ে যে নতুন গুদামঘর হয়েছে, সেখানে ঘড়িটা টাঙানো হয়েছে একটা শালখুঁটির গায়। ঘড়ির আওয়াজ তালবেতালিয়ার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো অব্দি শোনা যায়।

আগে আমাদের ছিল বেশ একটা থিতনো জীবন। কোনো কিছুতেই তাপ-উত্তাপ কিংবা ঘোড়ায় জিন দেবার কোনো ব্যাপার আমাদের ছিল না। সময় ধরার কলটা এসে এখন আমাদের সবাইকে ঠিক যেন ষাঁড়ের মত তাড়া ক'রে ফিরছে।

যে যেখানেই থাকুক, ঢং ক'রে আওয়াজ হলেই অমনি একটু নড়েচড়ে বসে।

প্রাপ্তির একটা ক'রে লক্ষ্য প্রত্যেকেই দাগিয়ে রেখেছে। মুখে লাগাম দিয়ে মন তাদের চাবুক মারতে থাকে যাতে হুস্ ক'রে সেখানে পৌঁছুনো যায়।

কী জ্বালা ! আমার কিছু পাওয়ার নেই, কোথাও পৌঁছুবারও নেই। বড়বাবুর ঘড়িটা তবুও থেকে থেকেই আমাকে খোঁচাচ্ছে।

চ্যাংমুড়িকে নিয়ে হয়েছে আরও মুশকিল। ও আবার ওর পেটের মধ্যে একটা ঘড়ি চালিয়ে দিয়ে বসে আছে। ও চায় সেটা রেসের ঘোড়ার মতন টগবগিয়ে ছুটুক। যাতে ওর মরা ডালে ফুল ফোটার দিনটা ঝটপট এগিয়ে আসে।

শুধু চ্যাংমুড়ি কেন, তালবেতালিয়ার বেবাক লোক এখন পড়ে গেছে কালের ফেরে। শুরু হয়েছিল ঘণ্টা দিয়ে। এখন কবে কী বার সে সম্বন্ধেও সবার টন্‌টনে জ্ঞান।

এ বিষয়ে আমিই যা এখনও পিছিয়ে প'ড়ে আছি।

চ্যাংমুড়িকে আমি জিগ্যেস করলাম, 'আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল কবে গো ?'

'দাঁড়াও, মনে করে দেখি। সেদিন ছিল গিয়ে, হ্যাঁ, বুধবার। আর আজ বুধ। তার মানে, বুধে বুধে আট।'

শনিবার আমি থাকতে পারিনি বলে সকলেরই কী আপশোস।

কাউকে বলা যাবে না, কিন্তু আমার ভাবটা অন্য। উৎসব, হৈ চৈ, গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা—আমার একেবারেই ধাতে সয় না। এখানে থাকলে ওটা আমার পক্ষে হত বেঁধে মার।

না থাকায় হয়েছে আরও ফ্যাসাদ। ছোট বড় সবাই একবার ক'রে আসছে আর তাদের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে আমার না দেখার দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে চাইছে। ফলে হয়েছে এই যে, নিজে উপস্থিত থাকলে চোখকান বুঁজে যেসব অবান্তর জিনিস ছেঁটেকেটে দিতে পারতাম, এখন তারও উপায় নেই।

পৈলু, পল্টন, সোনিয়া, আংটি চোখ বড় বড় ক'রে যা বলল মোটামুটি তা এই ঃ

—সে যদি তুমি দেখতে প্যান সাহেব, পায়ের পাতা ফেলা যায় না এমনি ভিড়। রাস্তার দু'ধারে বসে গেছে চায়ের দোকান, কাঠিবরফ, রঙবেরঙের খেলনা। ঠিক যেন রথের মেলা গো। দেখিনি অবিশ্যি, শুনেছি রথের মেলা ঐ রকমই হয়। রথ তো শুনেছি দড়ি বেঁধে মাটির ওপর দিয়ে টানে। কিন্তু এ কী রথ দেখলাম, প্যান সাহেব। এ রথ দেখি আকাশ থেকে পড়ে। গোঁ-গোঁ ক'রে সে কী আওয়াজ গো, প্যান সাহেব। এক গাঁয়ের লোক বলছিল, রথের মাথায় নাকি শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র। নিচে নেমে এসে এমন একটা ঝড় বইয়ে দিল যে,

আমরা সব উড়ে যাই আর কি। ভাগ্যিস, পেটমোটা ধুমসো পুলিসগুলো ছিল। তাদের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে কোনো গতিকে নিজেদের তো সামলালাম। রথ থেকে নামলেন রোগা, মোটা, দোহারা—আহা, ঠিক যেন তিন দেবতা। এক দুই তিন। হ্যাঁ, তিন। জানো প্যানসাহেব, এখন আমরা এক থেকে বারো গুণতে শিখে গিয়েছি। বারোর পর কী হয়, বলো তো ? বারোর পর আবার সেই এক। হ্যাঁ, তা যা বলছিলাম। খোলা গাড়িতে উঠে হাতজোড় ক'রে সকলের নমস্কার নিতে নিতে ভিড় ঠেলে ওঁরা যখন আমাদের গাঁয়ে পৌঁছুলেন ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় তিনটে। বাইরের লোকজনেরা এল নিচের রাস্তা অব্দি। ওপরে ওরা আসবেই বা কেন, আর আমরা ওদের খাতির ক'রে ডাকতেই বা যাব কেন ? এ তো আমাদের পরব। ওদের পরবে ওরা কখনও আমাদের ডাকে ? নতুন জামাকাপড় পরে আমাদের নাকি খুব সুন্দর দেখতে লাগছিল। ভিড়ের মধ্যে বাইরের দু-চারটে ডেকরা আমাদের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল। মরবার জায়গা পায়নি। ওরা ভেবেছে তাতেই আমরা গলে যাব। এখন তো আর আগের দিন নেই, প্যান সাহেব। দেবতাদের পায়ের ধুলো পড়েছে, আমাদের আর পায় কে ?...

বড়রা বলল একেকজন একেক রকম।

—মাথার ওপর চাকা ঘোরানো ওটা হেলিকপ্টার নয়, প্যান সাহেব ? দেখ, আমি বলেছিলাম কিনা। টেকো লোকটা হল গিয়ে ছোটলাট, দোহারাটি হেড মন্ত্রী আর মোটা লোকটা তার দোহার, ঐ যে বড় বড় চোঙা ঝুলছিল আর মুখের কাছে ফণা তোলা, ওটা হল মাইক—এক কথা বললে দশ কথা শোনাবার ক্ষমতা রাখে। আমাকে আর ওসব কী দেখাবে ! ওসব দেখে দেখেই তো এত বড়টা হয়েছি।

—কর্তারা যা বললেন তা তো ভালোই, তবে কথার আড়ে আড়ে ওঁরা বুঝিয়ে দিলেন এতদিন আমরা সব অমানুষ ছিলাম; ওঁরা এবার হাতে তুলে নিয়েছেন আমাদের মানুষ করার ভার। আমাদের কথা ছাড়ান দাও, আমরা তো হলাম পোকায়-কাটা দাগ-ধরা পয়মাল—নর্দমায় ফেলবার তলানি। কিন্তু তোমাদের কারখানার তৈরি মালও তো সব দেখলাম। একেকখানা চিজ বটে।

—তা তোমরা যাই বলো না বাপু, এ বেশ ভালো হল। ওঁরা তো ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের তো হয়ে এসেছে। আর ক'দিনই বা বাঁচব ? আমাদের হারানো মান ছেলেপুলেরা যদি ফিরে পায়, সেই তো ঢের।

—বড়বাবু, বড়বাবু, বড়বাবু। আহা, তা হবেই তো। এই পাঁকে ঐ পদ্মফুল না ফুটলে কেউ আমাদের ছুঁতো ?

—এখন দেখ কী হয় ? বেলা না গেলে কে বলবে—রাজকন্যা, না রাক্ষুসী ?

হাসপাতালে ক'দিন গিয়ে থেকে আসায় একটা ভালো হল যে, পায়ের নিচে শেকড় গজিয়ে যাওয়ার ভাব খানিকটা কাটানো গেছে।

চলতে চলতে কেন আমি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, তার কারণটা বার করা যায়নি। আমি ওসব নিয়ে আদৌ ভাবি না। কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজে থেকেই বললেন—শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আপনার হার্টে কোনো দোষ নেই।

ডাক্তারবাবু মানুষটা একটু অদ্ভুত। এ ক'দিন রোজই একবার ক'রে আমাকে দেখে গেছেন। দেখে গেছেন না বলে দেখা দিয়ে গেছেন বলাই ঠিক। রুগী দেখার মধ্যে থাকে ওঁর একটা দেখেও না দেখার ভাব। সেই সঙ্গে হাসি হাসি মুখ ক'রে এ-কথা সে-কথা—ভগবান জানেন, তার সঙ্গে অসুখের কী সম্বন্ধ। ওঁর এই ব্যবহারে সকলেই অখুশি হয়। রোগকে উনি কোনো রকম আমল দিতে চান না। তবু ওঁর খুব পসার, তার কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন কি বিনা ওষুধেও রোগ সারে ব'লে।

এক রুগীর কাছ থেকে অন্য রুগীর কাছে যাওয়ার সময় গুনগুন করে খুব মিহি গলায় হলেও ওঁর গান গাওয়াটা কারো কানেই ভালো ঠেকে না। হাজার হোক, রোগ তো! মানুষের কষ্টের এই ব্যাপারটাকে অমন হালকা করে দেখা হবে কেন?

রুগীর এই মনস্তত্ত্বের কথা ডাক্তারবাবু জানেন না তা নয়। তবু উনি নিজেকে শোধরাবেন না।

আমার ক্ষেত্রে ফল হয়েছে উল্টো। রোগ নিয়ে কোনো কথা বলেন নি বলেই ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়গুলো আমার খুব আনন্দে কেটেছে।

ডাক্তারবাবুর থিয়েটারঅন্ত প্রাণ। সে ওঁর কথা বলার ধরনেই বোঝা যায়। উনি বললেন, আমার নিজের এমেচার দল আছে। ভাবছি, আপনাদের ওখানে ইলেক্ট্রিক এসে গেলেই আপনাদের একদিন থিয়েটার দেখিয়ে আসব।

হাসপাতালের গাড়ি গেট দিয়ে ঢোকার সময় মনে হল যেন এক অচেনা রাজ্যে ঢুকছি। তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে চারদিক।

বড় বড় করে লেখা হয়েছে এখানকার নতুন নাম। নবজীবনগড়।

আপিসঘরের সামনে গাড়ি এসে থামতেই বড়বাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন।

'এখন সব ঠিক তো, প্যান সাহেব? ডাক্তারবাবু বলেছেন, ওটা কিছু নয়। ক'দিন একটু ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করতে হবে। তারপর আর আপনাকে ছাড়ছি না। এই আপনার চেয়ার আর টেবিল। হিসেবপত্তরের দিকটা আপনাকেই কিন্তু দেখতে হবে।'

হঠাৎ আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

কোনো রকমে বললাম, 'টেবিল-চেয়ারে আর আমাকে ফাঁসাবেন না, বড়বাবু। আমার যা কাজ আপনি দেবেন আমি ঘরে বসে করব।'

নিশ্চয় নিশ্চয় যাতে আপনার সুবিধে হয় আপনি তাই করবেন। এর মধ্যে আর বলার কী আছে?'

চ্যাংমুড়ির কাছে শুনলাম হাজী সাহেবের পাঠশালায় এখন পড়ুয়াদের বেশ ভিড় হচ্ছে।

ঝুপড়িগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ভাটিখানার চুল্লীগুলোও মাটিতে মিশে গেছে। একদিনও যাদের মদ না হলে চলত না, খোলকরতাল হাতে দিয়ে বড়বাবু তাদের হরিনামের এমন নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন যে, সন্ধ্যের পর আর কিছু দিয়েই এখন ধরে রাখা যায় না।

বড়বাবুদের পৈতৃক বাড়িতে সোমবার ডাকাত পড়েছিল। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করায় ডাকাতের দল ল্যাজ গুটিয়ে পালায়।

আর তার ঠিক পরের দিন এত লোক থাকতে ডাক্তারবাবুর গাড়ির কাঁচেই বা ইঁট এসে পড়বে কেন?

এর পেছনে যে একদলের গায়ের জ্বালা রয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়ায়নি। ওরা বুঝে গেছে, হাজার চেষ্টাতেও আর নবজীবনগড়কে তালবেতালিয়ায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

এও ঠিক, শহরের ঐ পাতালবাসীরাই ছিল তালবেতালিয়ার দাগী মানুষগুলোর সব চেয়ে কাছের লোক। ঘৃণ্য আর নির্ঘৃণ্যরা এসেছিল এক জায়গায়। দান নয়, করুণা নয়—এসেছিল দেওয়া-নেওয়ার সহজ সম্পর্কে। কানে ভালো হওয়া আর ভালো করার মন্ত্র দিয়ে দল ভাঙানোয় ওদের রাগ তো হওয়ারই কথা। যত যাই হোক, নিরাপদে পা রাখার যে জায়গাটুকু ছিল, এই পাল্টানে পড়ে আর সেটা রইল না। কে কত ভালোকর্‌নেওয়ালা সে তো ওদের জানাই আছে।

তবে যতই গজরাক আর ফোঁস করুক, আমাদেরই মতন ওরা ঢোঁড়া সাপ। মধ্যে সোনিয়া আর পৈলু একদিন শহরে গিয়েছিল। এখানকার পুরনো খদ্দের সেই ওয়াগন-ভাঙা দলের পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওদের দুজনকে দোকানে নিয়ে গিয়ে খুব খাইয়েছে। আসার সময় বলেছে, 'তোরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিস, ঠিক আছে। আমাদের দরজা তোদের জন্যে খোলা থাকবে।'

লোকটার কী আস্পর্ধার কথা।

এদিকে হৈ হৈ করে এগিয়ে যাচ্ছে নবজীবনগড়। বাইরে থেকে অনবরত লোক আসছে দেখতে।

ইলেকট্‌রিক এসে যাওয়ায় সকাল থেকে শোনা যায় মেশিনের ঘর্ঘর

রবিবার ছাড়া কোনোদিন এখানে পাখির ডাক শোনারও এখন উপায় নেই।

এরই মধ্যে বড়বাবু একদিন বোমা ফাটালেন।

মাথা মাথা লোকদের ডেকে এক বৈঠকে বললেন, সেবক সঙ্ঘের স্বামীজীর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। আসছে মাসের ষোলোই খুব ভালো দিন। ঐদিন হবে বারোয়ারি বিয়ে। একটা দিন আপনারা এ নিয়ে ভাবুন। কালকেই ব্যাপারটাকে আমরা পাকা করে ফেলব।

ঝড়ের মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না।

বিয়ের প্রসঙ্গটা এমন ধাঁ করে এসে পড়ল যে, এ নিয়ে আর কারো গাঁইগুঁই করার উপায়ই রইল না।

মেয়েপুরুষে জোড় বেঁধে থাকার ব্যাপারটা গোড়া থেকেই এখানে চলে আসছিল। না বনলে ছেড়ে চলে যাওয়া, তারপর আবার একদিন আর কারো সঙ্গে জোড় বাঁধা—এসব ছিল যার যার নিজের নিজের ব্যাপার। ও নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না।

আমরা তো ছিলাম দুনিয়ার বার। দুজনের এক হয়ে যাওয়াতেই ছিল আমাদের জগৎজয়ের আনন্দ। কোনো বন্ধন ছিল না, শুধু ছিল টান।

একবার এক সাধু বলেছিল—দ্যাখ্ বেটা, দুনিয়া মানে দুইয়ের খেলা। দুই নিয়েই দুনিয়া। জেনে রাখিস, বেটা—দুইয়ে সৃষ্টি, একে লয়।

বড়বাবু টানের সঙ্গে বন্ধনটা জুড়তে চান।

সেই যে মহাভারতে আছে না? আগে ছিল ধর্ম। ধর্ম বলতে, শুধু মনে ধরা। তারপর এল মর্যাদা। মর্যাদা বলতে, জমির আল। বীজ আর ক্ষেত্রকে বিবাহের গণ্ডী দিয়ে বাঁধা হল।

মনে থাকে যেন, তালবেতালিয়ার দিন শেষ। এখন আমরা উঠে এসেছি নবজীবনগড়ে। ধর্মকেও তাই উঠিয়ে আনতে হবে মর্যাদায়।

সাবেকের কথা তুলে লাভ নেই। আমরা অনেকেই সংসার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো নামের খোলসটাও ছেড়ে রেখে এসেছি। নামের বদলে এখন ধারণ করে রয়েছি কয়েকটা চিহ্ন। নিজেদের মধ্যে চলে। তার বাইরে নয়।

কার কী নাম। কে কার কে। সব নথিভুক্ত করতে হবে।

হাসপাতাল থেকে আসার পর থেকেই সমস্যাটা আমার মাথায় ঘুরছিল। ভেবে ভেবে আমি কোনো কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত বড়বাবুর শরণাপন্ন হলাম।

গোড়ায় তো উনি ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

'খাতায় নাম তোলা হবে। তার মধ্যে আর অত ভাবনাচিন্তার কী আছে, প্যান সাহেব ?'

আমি তখন তাঁকে সব খোলসা ক'রে বললাম। এক তো নাম না থাকার ব্যাপার। সে না হয় জুটিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু পদবীর ব্যাপার ? তখনই তো জাতবর্ণের ভেদগুলো খাড়া হয়ে উঠবে।

তাকিয়ে দেখলাম বড়বাবুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ক'দিন ধরেই আপনাকে বলব বলব করছিলাম, প্যান সাহেব। একজনকে বলেছিলাম বেতের কাজ শিখতে। সে আমাকে কী বলল, জানেন ? বলল, আমি কি ডোম না যুগী যে, বেতের কাজ করব ? এ রকম কেস একটা নয়, আরও আছে। এদের নিয়ে কী করা যায়, বলুন তো ?'

বড়বাবুকে একটু ঠেস দেবার জন্যেই বলব 'এ সব কী জানেন, বড়বাবু ? ভালো হওয়ার অসুখ।'

'তার মানে, এ সব বালাই এতদিন এখানে ছিল না ?' বড়বাবু যেন ঠাস করে আমার গালে চড় মারলেন।

বড়বাবু আমাকে এমন একটা মোক্ষম প্রশ্ন করে বসলেন, যার জন্যে আমি আদৌ তৈরি ছিলাম না।

বরং আমি বরাবর নিজেকে উল্টো বুঝিয়ে এসেছি।

তাকিয়ে রয়েছি অথচ দেখতে পাচ্ছি না। এতো হামেশাই হয়। চোখে পড়াতে গেলে চেয়ে দেখতে হয়। দেখার ক্ষেত্রে দেখতে চাওয়াটা খুব জরুরি। এতদিন আমি মনকে চোখ ঠেরেছি এই বলে যে, দুনিয়ায় যদি আস্ত মানুষ কেউ থেকে থাকে তো এই তালবেতালিয়ার ভাঙাচোরা লোকগুলো। কেননা বাইরের ভাগ-আড়ালগুলো রোগের এক ধাক্কায় এখানে ভেঙে গেছে।

বেশ বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়েছিল। ও সব নাই যদি থাকবে তো এল কেমন করে ?

কাজেই প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমাদের তো ছিল নরকগুলজার করা ব্যাপার। তাই দিয়ে জাতের বালাইগুলোকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিলাম।'

বড়বাবু হো হো ক'রে হাসলেন। মনে হল, আমার আত্মরক্ষার কায়দাটা ওঁর উপভোগ্য হয়েছে।

তা তো হল, কিন্তু নামের ব্যাপারটা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই তো রয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন বড়বাবুর সঙ্গে আবার দেখা করলাম।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে উনি বললেন, 'কিছু করার নেই, প্যান সাহেব। কিচ্ছু করার নেই। কাল রাত্তিরে বসে বসে আমি অনেক ভেবেছি।'

তারপর হাত দিয়ে নাকটা ঘষে নিয়ে বললেন, 'এক তো আছে নাম ভাঁড়াবার ব্যাপার। লোকলজ্জার ভয় ছাড়াও আখেরের কথা ভেবে লোকে রোগী হিসেবে দু'নম্বরী নাম নেয়। ভাঁড়ানো নামে ছোট জাতের কোনো পদবী পাবেন না, প্যান সাহেব। সেদিক দিয়ে একটা বাঁচোয়া। দু-চারজন সহজ সরল মানুষের বেলাতেই অমন দু-একটা পদবী মিলবে। এক চৌধুরী বসিয়েই আপনি অনায়াসে তার হিল্লে করে ফেলতে পারবেন। সংখ্যালঘুদের নিয়েই হবে আদত মুশকিল। কে আদিবাসী, কে মুসলমান, কে খৃষ্টান, কে ভিন্‌রাজ্যের—নামেই সব ধরা পড়ে যাবে। সেটা একমাত্র এড়ানো সম্ভব হত নামের জায়গায় নম্বর বসাতে পারলে। তাছাড়া, আপনি কি ভাবছেন, এ সব ভেদ অত সহজেই ঘোচানো যাবে ? আমি তো মনে করি, মানুষকে কোনোদিনই একরঙা এবং আগাপাশতলা একমাপের করা যাবে না।' বলতে বলতে, বড়বাবুর যা মুদ্রাদোষ, অনেকবারই হাত দিয়ে নাক ঘষে নিলেন। এটা উনি আরও বেশি করেন যখন ওঁকে ভেবে ভেবে বলতে হয়।

ওঁর কথায় সায় না দিয়ে পারলাম না।

পরক্ষণেই মনে হল—কী ব্যাপার, আস্তে আস্তে আমি বড়বাবুর দলে ভিড়ে পড়ছি নাকি ! এটা না হয় হল, কিন্তু আর সব ব্যাপারে আমাকে একটু চোখকান খুলে রেখে চলতে হবে।

যেমন এই বিয়ের ব্যাপারটা। আমি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। সামাজিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই বড়বাবু আমাদের এক-পা এক-পা ক'রে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

তবে ওঁর অসম্ভব নাড়ি-জ্ঞান। উনি লোকের মন বোঝেন। বারোয়ারি বিয়ের প্রস্তাবটা সকলে যে এভাবে লুফে নেবে, আমি ভাবতেই পারিনি।

আমার তো আক্কেল গুড়ুম চ্যাংমুড়িকে নেচে উঠতে দেখে। আমাকে একবার জিগ্যেস পর্যন্ত করেনি। নিজেই আগ বাড়িয়ে আপিসে গিয়ে বিবাহার্থী হিসেবে আমাদের দুজনের নাম লিখিয়ে এসেছে। আমার সেই কথা বড় মুখ করে আমাকে বলছে।

এত রাগ হচ্ছিল বলার নয়। ইচ্ছে করছিল দেয়ালে ওর মুখটা ঘষে দিতে।

কিন্তু চ্যাংমুড়ির কোনো রকম বিকার নেই। ওর ওপর রাগ করি, আবার ওকে ভালোও লাগে ঐ একটা কারণে। ওর ধারণা, ও যেটা ভাবছে,

pathagar.net

অবিকল সেটাই অন্য সবার মাথাতেও ঘুরছে। আর কেউ যে অন্য কিছু ভাবতে পারে, এটা ওর ধারণার বাইরে। বললে মিচকে মিচকে হাসে। ভাবে, দুষ্টুমি ক'রে ওর পেছনে লাগা হচ্ছে।

চ্যাংমুড়িকে ব'লে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু আমি ঐ ভাঁড়ামির মধ্যে নেই। শুনছি ঠিকেদারের কাছে শ'য়ে শ'য়ে মালার অর্ডার গেছে। তাঁতঘরে কনেদের জন্যে তৈরি হচ্ছে রাঙা শাড়ি। ছেলে, বাপ, মা, মেয়ে একেবারে দুই পুরুষের এক লপ্তে বিয়ে।

একহাতে গরম চা নিয়ে চ্যাংমুড়ি আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে বলল, 'কে এসেছে, দেখ।'

তাকিয়ে দেখি সোনিয়া। পরনে একটা লালশাড়ি, কপালে জ্বল জ্বল করছে লাল টিপ।

থুতনিটা ধ'রে আদর ক'রে বললাম, 'তোকে তো একদম কনেবউয়ের মত দেখাচ্ছে রে।' বলতেই পেছন থেকে আরেকটা মুখ এগিয়ে এল।

'পৈলু না? তুই কোথ্থেকে?'

ওর লজ্জা-লজ্জা ভাব দেখে তখন আমার খেয়াল হল। 'বুঝেছি, বুঝেছি। দাঁড়া, মুখটা ধুয়ে আমি এক্ষুনি আসছি, চলে যাস্ নে যেন।'

ফিরে এসে দেখি চ্যাংমুড়ি স্নানে চলে গেছে।

চোখে হাতচাপা দিয়ে সোনিয়া বসে আছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়েও ও কেন তাকাচ্ছে না?

হাতদুটো জোর ক'রে সরাতেই সোনিয়া ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। অবাক হয়ে পৈলুর দিকে তাকালাম। পৈলু মাথাটা নামিয়ে নিল।

সোনিয়ার চোখে জল দেখে এক লহমায় সেই কাক-ডাকা ভোরের দৃশ্যটা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল।

রক্তমাংসের এইটুকু একটা পুতুলকে সদ্য মাটিচাপা দিয়ে চলে আসব ব'লে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ দেখি দূরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে এক বিষাদ-প্রতিমা। আমি না দেখার ভাণ ক'রেছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম সোনিয়া একদিন কাঁদবে।

আমার মনের মধ্যে যে কাঁটাটা এতদিন বিঁধে ছিল, চোখের জলে সোনিয়া সেটাকে নিপুণভাবে তুলে দিল। পৈলুর মুখ নিচু করা থেকে এও বুঝেছিলাম, পৈলুকে ও সব বলেছে।

সোনিয়ার মাথায় হাত রেখে বললাম, 'আমার খুব দাদু হওয়ার শখ রে, সোনিয়া।'

সঙ্গে সঙ্গে কান্না ভুলে সোনিয়া হাসতে হাসতে আমাকে মারবার জন্যে হাত

pathagar.net

ওঠাল।

'শুভদিনে মারামারি নয়, মারামারি নয়-' বলতে বলতে চ্যাংমুড়ি ঘরে ঢুকল। তারও পরনে রাঙা শাড়ি, কপালে টিপ। হাতে মেহেদির ছাপ। ওর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আমি মুখ খোলবার আগেই আমার সামনে একটা কাচা ফতুয়া আর পাজামা ফেলে দিয়ে বলল, 'বেলা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি।'

সোনিয়া আমার হাত ধরে না টানলে আমি কক্ষনো উঠতাম না।

হল খুব মজার কাণ্ড। বাপের জন্মে এমন জিনিস দেখি নি।

মাটি ফেলে একটা উঁচু বেদী করা হয়েছিল। তার ওপর কম্বলের আসনে এসে বসলেন স্বামীজী। ভারি সৌম্য চেহারা।

নিচে জ্বালানো হয়েছে হোমের আগুন।

রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাথার ওপর টাঙানো হয়েছে শামিয়ানা। ধূপের গন্ধে গোটা জায়গাটা ম' ম' করছে।

তাকিয়ে দেখলাম জোড়ায় জোড়ায় সব ব'সে। হাঁড়িচাচা, হাজী সাহেব, দুখন্তি, বাতাসী, পল্টন, আংটি কেউ বাদ নেই। কারো কারো বেলায় আমার যা আন্দাজ ছিল তা মিলল না।

স্বামীজী গোড়ায় সংস্কৃতে একটু স্বস্তিবাচন করে নিলেন। গোটা মণ্ডপ জুড়ে গমগম করতে লাগল তাঁর কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য এক প্রসাদগুণ সেই গলায়।

'সামনে প্রজ্বলিত অগ্নি। তাহলে শুরু হোক আমাদের আনন্দযজ্ঞ। যাকে আপনারা আজ হোতার আসনে বসিয়েছেন, সেই আমি আপনাদের মতই সমাজসংসারের অন্তেবাসী। আমার ভক্তি দেবদ্বিজে নয় মানুষে। সেবাই আমার ধর্ম। নিয়ম-আচার সাধনপদ্ধতিতে আমি অপটু। আমি তাই সবার হয়ে আবাহন করি জীববর্গের স্রষ্টা সেই প্রজাপতিকে, যিনি পৃথিবীর রক্ষক। করুণা দিয়ে আমাদের সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি তিনি ঢেকে দিন। মনে মনে সবাই বলুন, আজকের এই অনুষ্ঠান কল্যাণকর হোক। সার্থক হোক শুভপরিণয়কর্মের এই পুণ্য দিন।'.....

মধুক্ষরা সেই কণ্ঠে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ।

ডাল থেকে ডালে উড়ে বসা চলচঞ্চল পাখির মত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে অবলীলায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন।

ঋগ্‌বেদে আছে কাক্ষীবান ঋষির মেয়ে ঘোষা। স্বামীজী তার কথা বললেন। কুমারী অবস্থায় কুষ্ঠরোগ হয়ে বেচারার বয়সকাল চলে গিয়েছিল। দেবতার বরে শেষে সে ফিরে পেল তার যৌবন আর বিয়ের যোগ্য স্বামী। দেববৈদ্য দুই

অশ্বিদেবতার স্তব ক'রে সে বলছে : হে অশ্বিযুগল : যার চলার ক্ষমতা নেই, যে নিচে পড়ে আছে তোমরাই তার ভরসা। যে অন্ধ, যে দুর্বল, যে রোগজর্জর তোমরাই তাকে সারিয়ে তোলো। এই আমি তোমাদের ডাকছি, তোমরা শোনো। আমার কোনো আপ্তবন্ধু নেই, আমি অজ্ঞান, আমার জাতিকুটুম্ব নেই, বুদ্ধি নেই। বিপদে পড়ার আগেই আমাকে তোমরা রক্ষা করো। ছিন্নপদ বিপ্পলাকে যেমন হাঁটার জন্যে দিয়েছিলে লোহার পা। হে অশ্বিযুগল, দিনে কোথায় রাত্রেই বা কোথায় তোমরা যাও ? কেমন ক'রে সময় কাটে ? আমি রাজকন্যা ঘোষা, আমি চারিদিকে তোমাদের কথাই বলি। আমি ঘোষা, আমি এখন পূর্ণলক্ষণযুক্ত নারী। আমাকে বিয়ে করতে বর এসেছে, দেখ। তোমরা বিদীর্ণ করো মেঘ, সাত মুখে তাই বর্ষণ হয়। মাঠ ফসলে ভরে উঠুক। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। আমাকে পতির প্রিয়পাত্র করো। হে অশ্বিযুগল, তোমরা আজ কোথায় ?

তারপর বললেন ওষধিদের কাছে ভিষক্ ঋষির স্তুতির কথা।

হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ, তোমরা মাটি ফুঁড়ে ওঠো। আরোগ্য করো। রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। যে ওষধি জানে, সেই বুদ্ধিমান ভিষক্‌কে বলে চিকিৎসক। রোগ ধ্বংস করা তার কাজ। হে রোগী, এই, গরুর পাল যেমন গোশালা থেকে বেরোয়, তেমনি ওষধির গুণগুলো বেরিয়ে আসছে ওরা তোমাকে দেবে স্বাস্থ্যের সম্পদ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শরীরে যে ব্যাধি ছিল, তাকে দূর করল ওষধি। এই ছিল, দেখ আর নেই। হে ওষধিগণ, তোমাদের একজন আরেকজনকে রক্ষা করুক, তাকে আবার রক্ষা করুক আরেকজন। এইভাবে সকলে একযোগে একমত হয়ে আমার কথা রক্ষা করো। হে ওষধিগণ, আমি তোমাদের খননকর্তা, আমি যেন নষ্ট না হই—যার জন্যে করছি সেও যেন নষ্ট না হয়। তুমি পারো বাসনা পূর্ণ করতে, হৃদয়কে সুখী করতে। যে সব ওষধি আমার এই কথা শুনতে পাচ্ছে আর যারা আছে দূরাতিদূরে—তারা সবাই এক হয়ে আমার হাতের এই ওষধিকে বীর্যবতী করুক।

আর প্রজাপতিপুত্র যক্ষানাশন ঋষি বলছেন :

হে রোগী, এই যজ্ঞসামগ্রী দিয়ে তোমাকে অপরিজ্ঞাত রোগ থেকে মোচন করে দিচ্ছি, তাহলে তোমার জীবন রক্ষা পাবে। যদি কোনো দুর্গ্রহের পাল্লায় পড়ে থাকে, তাহলে তার হাত থেকে, হে ইন্দ্র, হে অগ্নি তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। যদি এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে থাকে, যদি মরেও গিয়ে থাকে কিংবা মৃতপ্রায় হয়, তবু আমি মৃত্যুদেবতা নির্ঋতির কাছ তাকে ফিরিয়ে আনছি। হে রোগী, তুমি বেঁচে থাকো একশোটা শরৎসুখে কাটাও একশো হেমন্ত, একশো

বসন্ত। হে রোগী, তোমাকে আমি পেয়েছি। আমি নতুন ক'রে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি।'

রাক্ষস-নিধনকারী অগ্নির কাছে ব্রহ্মপুত্রের প্রার্থনা :

নারী যাতে আক্রান্ত হয় এখান থেকে তার সেই সমস্ত বাধা, সমস্ত উপদ্রব, সব রোগ অপনয়ন করুন অগ্নি। পুরুষের শুক্রসঞ্চার কালেই হোক, গর্ভ উৎপন্ন হবার কালেই হোক, অথবা জঠরে আন্দোলিত হবার কালেই হোক, অথবা ভূমিষ্ঠ হবার সময়েই হোক, হে নারী, যে তোমার গর্ভ নষ্ট করে বা করতে চায় তাকে আমরা ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়েছি। ভ্রাতা, পতি বা উপপতি সেজে যে রাক্ষস তোমার গর্ভ নষ্ট করতে চায়, তাকে আমরা এখান থেকে উৎপাটিত করেছি। যে রাক্ষস স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাকে মুগ্ধ ক'রে কাছে গিয়ে তোমার গর্ভ নষ্ট করতে চায়,এখান থেকে, হে নারী, তাকে আমরা দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। এমন আবিষ্ট অবস্থা আমার আগে কখনও হয় নি। ঘরে ফিরলাম জড়ানো পায়ে। কানে সঙ্গীতের মূর্ছনার মত সমানে বাজছে আমি সাম, তুমি ঋক্। আমি দ্যৌ, তুমি পৃথিবী।

অনেকক্ষণ আমি আচ্ছন্নের মত ব'সে রইলাম।

চ্যাংমুড়ি কখন যে আমার হাতে সীলমোহর করা একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে রাঁধতে চলে গিয়েছে, আমার কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরে ছিল অন্ধকার। তবু কাগজের একটা জায়গায় জ্বলজ্বল ক'রে উঠল একটা নাম : আমি, কুলসুম বিবি...

কেননা জানলা দিয়ে যে জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল, সেটা ছিল কেরোসিনের আলোর চেয়েও ঢের জোরালো।

আমাকে হারিয়ে দিয়েছে কুলসুম। ধ্যুৎ, চ্যাংমুড়ি।

কোনো কোনো হারে আনন্দ আছে। সেদিন হাতে হাতে তা প্রমাণ হয়ে গেল।

আমি ফেঁসে গেলাম বটে, কিন্তু তাহলেও এসব জিনিস আমার ঠিক বরদাস্ত হয় না। হয় না বলছি, কিন্তু কোনো কথাটি না বলে দিব্যি তো সব মেনে নিলাম।

এটাই হল আমার চরিত্রের দোষ। আমি নিজের জায়গায় ঠিক ডেঁটে দাঁড়াতে পারি না। যখন মনে হয় এর একটা প্রতিবাদ করা দরকার, তখন আবার হয় উল্টো উৎপত্তি। তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা গরম ক'রে ফেলি।

সেদিক দিয়ে খলিফা লোক হলেন বড়বাবু। পেছন থেকে নৌকোর হালটা শক্ত ক'রে উনি ধরে রেখেছেন। আর সবাই তো পেছন ফিরে বৈঠা মারছে।

কখন কোন্ বাঁক নিতে হবে সেটা নিঃশব্দে ঠিক করছেন বড়বাবু।

বড়বাবুর একটা সুবিধের দিক আছে। ওঁর আছে একটা তৈরি জগৎ। তারই ছাঁচে উনি নবজীবনগড়কে ঢালতে চান। তার মধ্যেকার গলদগুলো দেখিয়ে দিলে উনি বলবেন, ওসব একটু হুঁশ ক'রে সেরেসুরে নেওয়ার ব্যাপার। একটা দুটো কোয়া পোকায়-খাওয়া ব'লে গোটা কাঁঠালটাই কেন ফেলে দিতে হবে?

উপমার ধামা দিয়ে যেখানে যুক্তিকে চাপা দেওয়া হয় সেখানে তর্ক করা বৃথা।

যখন খুব রাগ হয়, মনে মনে ভাবি—একদিন এমন আচ্ছা করে ধুড়ধুড়ি নেড়ে দেব যে, ওঁর থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। কী বলব তাও ঠিক করে রেখেছি। বলব, উনি তো ওঁর ঐ বস্তাপচা সমাজেরই পাহারাদার হয়ে এখানে আছেন। যাতে চোর আর ভিখিরি হয়ে, আইনশৃঙ্খলার দফারফা করে আমরা ওঁদের রাতের ঘুম না কেড়ে নিই। সরকারী মুষ্টিভিক্ষা মানে তো পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙা।

আমার এইভাবে ভাবাটা যদি সত্যিও হয়, বড়বাবু কিন্তু কিছুই সজ্ঞানে জেনেবুঝে করছেন না। এটা করার মধ্যে ওঁর নিজের কোনো স্বার্থ নেই। বরং এসব না করে উনি হয়ত আরও আরামে থাকতে পারতেন।

সমাজ যাদের ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিল, এখন এই নবজীবনগড়ে অনেক মক্কেল এসে তাদের ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলছে, আপনি-আজ্ঞে করছে আর বসবার জন্যে চেয়ার এগিয়ে দিচ্ছে। তলবেতালিয়ায় এ কেউ ভাবতে পেরেছিল?

রক্তচোষাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এখন যারা আসছে তারা মহা তেঁটে লোক। কখনও জাতের, কখনও ধর্মের ধুয়ো তুলে নিজেদের কোলে ঝোল টানার জন্যে তারা ওদের ওস্কাচ্ছে। কেননা তাদের তাতে দাঁও মারার সুবিধে।

কেউ কেউ আপিসঘরে চেয়ারে এমন গ্যাঁট হয়ে বসে যে দেখে মনে হয় তারা উঠতে পারছে না চেয়ারটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে। বসে বড়বাবুর চেয়ারের দিকে আজকাল ঘন ঘন যেভাবে ওরা নজর দেয় সেটা কি ওঁর চোখে পড়েছে?

বড়বাবু যেরকম সেয়ানা লোক তাতে ওঁর চোখে না পড়েই পারে না। কিন্তু বোধহয় কার কতটা দৌড় জানেন বলেই উনি ঘাবড়ান না।

আজকাল খুব পুরনো একটা কথা হঠাৎ হঠাৎ মনের মধ্যে ঘাই দিচ্ছে। আমার কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ল আর তখন আমি সমাজসংসার ছেড়ে চলে এলাম—এটা কি বিলকুল ঠিক? নাকি কোনো না কোনোভাবে আমি

পালানোরই ছুতো খুঁজছিলাম ! জো পেয়ে গেলাম কুষ্ঠ হওয়ায় !

নইলে একজন লেখাপড়াজানা লোক রোগ হয়েছে বলে মূর্খের মত ভয় পেয়ে ওভাবে পালায় ? এ রোগ এখন সহজেই নিরাময়যোগ্য এবং কুষ্ঠমাত্রই ছোঁয়াচে নয়—এসব কথা কস্মিনকালে সে কি কাগজে পড়ে নি ? দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি জানবে না এবং চিকিৎসা করে সেরে যাবে, তার যে অনেক উপায়—সেও তো তার করায়ত্ত ছিল। তাহলে ?

জীবন ঠিক যুক্তির পথ ধরে চলে না। যেতে যেতে আচমকা বাঁক নেয়। তাতে কিন্তু মজা আছে।

সোনিয়া মুখপুড়ি খেতে বলেছিল কাল। এমন পাজী বলে কিনা, চ্যাংমুড়িকে সাধ খাওয়াচ্ছে। রেঁধেছিল দুখন্তি। বাতাসী তরকারি কুটেছিল। চড়ুইভাতিতে যেমন হয়। চাঁদা করে একসঙ্গে খাওয়া।

পৈলু যে ডাক্তারবাবুকেও খেতে বলেছে, সোনিয়া সেটা আগে ভাঙেনি। হঠাৎ দেখি প্যাঁক প্যাঁক ক'রে এসে থামল ডাক্তারবাবুর গাড়ি। মিষ্টির একটা হাঁড়ি পৈলু গিয়ে নামিয়ে আনল।

ডাক্তারবাবু বসে পড়ে তাঁর ডাক্তারী ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে দিয়ে যেটা বার করে আনলেন, ও হরি, সেটা একটা পুতুল। তারপর সেটাকে ডান কোলের ওপর বসালেন।

পুতুলটা ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে উঠতেই ডাক্তারবাবু পা নাচিয়ে তার কান্না থামালেন।

আমরা অবাক। সত্যিই তো কথা বলা পুতুল। ওর মধ্যে নিশ্চয় কোনো টেপরেকর্ডার বসানো আছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুতুলটার তাকানোর ভঙ্গি মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর কানে কানে কথা বলা—সব মিলিয়ে এমন মজাদার যে বলার নয়।

খেতে বসার আগে পর্যন্ত সমানে এই জিনিস চলল।

পুতুলটা আবার এমন এমন কথা বলছিল যা আগে থেকে তৈরি করে রাখা সম্ভব নয়। 'এই মরেছে, প্যানসাহেবের হাই উঠছে'—এসবই তো তক্ষুনিকার ব্যাপার। কাজেই রেকর্ড নয়।

অথচ ডাক্তারবাবুর তো ঠোঁট নড়ছে না, গলাও নড়ছে না।

তাহলে হচ্ছে কেমন করে ? তখন মনে পড়ল, শুনেছি ভেন্‌ট্রিলোকিস্টরা এ জিনিস পারে।

যাবার আগে চ্যাংমুড়ির দিকে একবার চোখের ইশারা করে গলাটা নামিয়ে ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, 'আর খুব বেশি দেরি নেই, প্যানসাহেব। মনে হচ্ছে, ভোটের আগেই।'

pathagar.net

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ভোট ?'

'বা রে। আপনি কিছুই খবর রাখেন না, দেখছি। এতদিন টালবাহানার পর আজকেই বড়বাবুর কাছে পাকা চিঠি এসে গেছে। এখানে তো বেশির ভাগ সাবালক। তাই ভোটও অনেক। দু একদিনের মধ্যেই, দেখুন, এখানে কী খেল্ লেগে যায়।'

ডাক্তারবাবু চলে যেতে চ্যাংমুড়ি জিগ্যেস করল, 'ভোট জিনিসটা কী গো ?'

তাড়াতাড়ি এড়াবার জন্যে বললাম, 'একরকমের মানসিক।'

একটা সময় ছিল যখন আমি সামনে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখতাম। ফলে, পেছনের অনেকটাই আমার চোখের আড়ালে পড়ে যেত। চলা মানেই ছিল তখন পিছু হাঁটা।

এখন হয়েছে ঠিক তার উল্টো। নিজেকে এখন দেখছি পেছন থেকে। ফলে, সামনের অনেকটাই এখন নজরের বাইরে। যেটা সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে, চোখমুখের ভাবগুলো পেছন থেকে একেবারেই দেখতে পাচ্ছি না। এ এক ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা।

হাজী সাহেব ইদানীং পাঁচওক্ত নমাজ পড়ছেন, এ খবরটা বড়বাবুই সেদিন আমাকে দিলেন। চ্যাংমুড়ি মাঝে রোজা রাখবে বলে নেচেছিল। ডাক্তারবাবুর ধাতানিতে শেষ পর্যন্ত চুপ করে গেছে।

নবজীবনগড়ের গোড়াপত্তন থেকেই আদিবাসী লোকগুলো নিজেদের একটু আলাদা করে নিয়েছে। অন্যদের সঙ্গে ওরা আর এখন ততটা মেশে না।

এর ছেলে ওর ছেলে—এসব ভেদই আগে ছিল না। ছেলেমেয়েদের এখন হাঁচতে কাশতে চাই বাপের নাম।

কথায় কথায় চ্যাংমুড়ি সেদিন জিগ্যেস করেছিল আমার অসুখ হওয়ার আগের কোনো ছবি আছে কিনা।

আমি নেই বলায় ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পোকায়-কাটা মানুষগুলোর এই একটা সুবিধে। বাচ্চা হলে কার মত দেখতে হল এ নিয়ে মন্তব্য করার কোনো উপায় থাকে না। যে আসলটার সঙ্গে মেলাবে তার আদত রূপটাই তো কারো জানা নেই।

এসব নতুন উপসর্গ এসে জুটেছে নবজীবনগড়ে। নইলে আগে এ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না।

ছিল না বলাটা আমার একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। আসলে বলা উচিত ভুলে ছিলাম। কোনো উপায় ছিল না ভুলে না গিয়ে।

কাল রাত্রের দিকে হঠাৎ ভবীকে নিয়ে বড়বাবু এসে হাজির। ভবী

এসেছিলেন চ্যাংমুড়ির খবর নিতে।

বড়বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে একথা সেকথা হল।

বললেন এতদিন পর এখানকার লোকে এই যে ভোটের অধিকার পেল, এটা ছিল তাঁর অনেকদিনের স্বপ্ন।

সত্যি, বড়বাবুর স্বপ্নের শেষ নেই।

কিন্তু আমি অপেক্ষা করছিলাম ওঁর মুখ থেকে এর পরের কথাটা শোনবার জন্যে।

ঠিক সেইসময় বাইরে হাঁড়িচাচার গলা শোনা গেল।

'বড়বাবু, আছেন ? বড়বাবু ?'

'যাই', ব'লে বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন।

ফিরতে ওঁর বেশ দেরি হল। রং এখন অনেকটা পুড়ে গেছে, তবু রেগে গেলে মুখের মধ্যে এখনও তা প্রকাশ পায়।

দাঁড়ান, আগে একটু জল খেয়ে নিই তারপর বলছি।'

আমাকে ওঠবার সময় না দিয়ে বড়বাবু নিজেই কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিলেন।

ঢকঢক ক'রে জল খেয়ে নিয়ে ঠকাস ক'রে গেলাসটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'এই এক জাত পয়দা হয়েছে, প্যানসাহেব—ঠিকেদার। শুরু ইংরেজরাই করে গেছে। স্বাধীন হয়ে আমরা তাদের ঘাড়েগর্দানে আরও চর্বি যুগিয়েছি।

'গিয়ে দেখি বসে আছে এক হোঁদল কুৎকুৎ। পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি দেখেই বুঝেছি নির্ঘাৎ ঠিকেদার। আমি না ব'সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললাম, এটা তো আপিসের সময় নয়।

'লোকটা নির্লজ্জের মত বলল, অসময়টাই আমাদের সময়, বড়বাবু।'

'ঢঙের কথা শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। তবু আমি ঠাণ্ডা মেজাজেই বললাম, আপনার দরকার থাকলে সোম থেকে শুক্কুর যে কোনো কাজের দিনে বেলা থাকতে আসবেন।

'ও তখন বুঝেছে আমি ঢ্যাঁটা। তখন কী করল জানেন ? হাতে এক বাণ্ডিল নোট নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, সমিতির জন্যে হাজার দশেক টাকা এনেছিলাম। সেইসঙ্গে চোখটা একটু নাচিয়ে যোগ করল—না, না, না। রশিদ-টশিদের কোনো ব্যাপারই নয়।'

'আমি দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বললাম, গেট আউট।'

'সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে লোকটার পালানো যদি দেখতেন। শুনলাম গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার পর নাকি চেঁচিয়ে বলেছে আমাকে দেখে নেবে।'

গেলাসের তলানি জলটুকু দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেশের আজ

এই তো অবস্থা, প্যানসাহেব।'

বড়বাবু ভাবেন এসব শুনে আমার পিলে চম্‌কে যাবে। উনি তো জানেন না, আমিও ঐ জাতেরই লোক ছিলাম। শুধু আরেকটু ভদ্রস্থ এবং আরেকটু পালিশ-করা—তবে হরেদরে একই মাল।

বড়বাবুর বসার ধরন দেখে বুঝলাম, আজ উনি হাতে সময় নিয়েই এসেছেন।

হাত দিয়ে আগের প্রসঙ্গ উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি ক'রে বললেন, 'যাক ওসব। হ্যাঁ, সেই যা বলছিলাম, ভোটের কথা—'

এখানে এমনভাবে ভোটের বাজার শুরু হয়ে যাবে গোড়ায় আমার ধারণাতেও আসেনি।

সব পাকা হয়ে গেলেও গেজেট হওয়া অব্দি সবাই অপেক্ষা করছিল। সেটা হয়ে যেতেই, ব্যস মালগাড়িটা হয়ে গেল একেবারে মেলগাড়ি। ফুল স্পীড। এখন শিরে সংক্রান্তি। হাতে কয়েকটামাত্র দিন।

শহর থেকে নেমে এল যেন ঢল। কেননা এই একটা চত্বরে একেবারে ঠাসা ভোট। যে হাতাতে পারবে তার জিত।

লরি গাড়ি হ্যাণ্ডবিল পোস্টার রংবেরঙের নিশানে ছয়লাপ হয়ে গেল নবজীবনগড়।

কুষ্ঠরুগীদের দুঃখে দুঃখী যে এত মানুষ আছে এখানকার লোকে বাপের জন্মে কেউ কখনও দেখেনি।

ইস্কুলডাঙায় রোজ একটা করে সভা হচ্ছে।

গলা কাঁপিয়ে কী সব বক্তৃতা! সভাটাকে একটু তাতিয়ে নেবার জন্যে গোড়ার পাঁচ মিনিট সমানে চলে স্লোগান দেওয়া। তারপর গলায় মধু-ঢালা সম্বোধন : ভাইসব, বন্ধুগণ, প্রিয় ভাইবোনেরা—কেউ আবার এফেক্ট আনার জন্যে বলেন—ভাইবন্ধু মা-বোনেরা আমার, কিংবা, হে দুর্ভাগ্য মানব-মানবী!

আমার পিত্তি জ্বলে যায় এসব ন্যাকামি শুনলে। আমি সভায় গিয়েছিলাম মোটে দুদিন। প্রথম দিন আর শেষের দিন। অন্যদিনগুলোতেও ঘরে ব'সে থেকেও কান ঝালাপালা হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাইনি।

এক' দিনে একটা জিনিস বোঝা গেছে। সব দলই আমাদের এই নবজীবনগড়ে কিছু কিছু লোককে হাত করেছে। সবাইকে যে টাকা দিয়ে বশ করা হয়েছে তা নয়। পৈলুদের দল ক'দিন ঝাণ্ডা ঘাড়ে ক'রে যাদের হয়ে 'ভোট দাও' 'ভোট দাও' ক'রে বেড়াচ্ছে যে যাই বলুক, তাদের টানই এখানে মোক্ষম। সামনে না এলেও ছায়ার মত হাঁড়িচাচা যে তাদের সঙ্গে আছে, সেটা আমার

pathagar.net

বিলক্ষণ জানা।

সরকারী দলের হয়ে মোটাসোটা যে লোকটা বক্তৃতা ক'রে গেল সে একটা আস্ত উজবুক। এখানকার কিছু লোক অভ্যাগতদের খাতির ক'রে চা-সন্দেশ দিয়েছিল। লোকটা বলল—রক্ষে করো, আজ আমাদের উপোষ। 'রক্ষে করো' এবং 'আমাদের' কথাটাতেই সবাই যা বোঝবার বুঝে গেল। ওর পর যে বলতে উঠল সেও এক চিজ। দুজনেরই মোদ্দা কথা হল—তালবেতালিয়া ছিল এক নরক, সরকার সেখানে নবজীবনগড়ের পত্তন ক'রে স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছে। হাততালি দেবার লোক আগে থেকে ঠিক করা ছিল। কিন্তু কিছু লোকের বেতালা চিৎকারে হাততালিটা মাঠে মারা গেল।

বড়বাবু পরে আমাকে দুঃখ ক'রে বললেন, 'দেশের কী হাল হয়েছে, দেখুন। ওর মধ্যে একজনের বিড়ির কারখানা, আরেকজনের চালের কারবার। এখন কী জানেন, রাজনীতিটাও হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাবসা।'

ক'দিন পরে ভাবলাম, আজ তো শেষদিন। যাই একবার শুনে আসি কে কী বলে।

এদিন চা-সন্দেশ আনার পালা ছিল পৈলুদের। রোগামতন এক ভদ্রলোক। উস্‌কোখুস্‌কো চুল। শুনলাম ভোটে উনিই দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পাশের লোকটি গোলগাল। হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ। দুজনেই হাতজোড় করলেন। দুজনেরই নাকি অম্বলের রোগ। বুঝলাম, এঁরা উপোষ করেন না, অম্বলে ভোগেন।

ওঃ, কী আগুনছোটানো বক্তৃতা। ওঁরা বললেন, এই পচাগলা সমাজটাকে না পাল্টালে কিচ্ছু হবার নয়। দুনিয়া জুড়ে চলেছে তাই নিচের মানুষকে ওপরে তোলার লড়াই। পীড়িতের দল আর নিপীড়িতের দল যদি এক হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই মানুষের কপাল ফেরানোর চাবিকাঠিটা ঠিকঠাক হাতে এসে যাবে। অবশ্য এটাও তাঁরা বলতে ভুললেন না যে ঝাণ্ডার মধ্যেও আজকাল ভেজাল এসে গেছে। 'শুধু নাম দেখে ভুলবেন না। যদি সাচ্চা জিনিস চান তাহলে মনে রাখবেন, এই হল তার ছাপ।' ব'লে বড় ক'রে আঁকা একটা ছবি উঁচু করে ধরলেন।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কি হতাশ হয়ে পড়েছি?

আমার তা মনে হয় না। কেননা তাহলে ভোরে উঠে গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়ে অতখানি রাস্তা মনের আনন্দে হেঁটে আসা আমার পক্ষে কি সম্ভব হত? বরং ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকতাম।

কী চ্যাংমুড়ি? বাপ্‌রে, ভোঁস ভোঁস ক'রে এখনও কী ঘুমোচ্ছে। দেখ! আজ ভোটের আগের দিন। মিটিং, মিছিল, গলাবাজি,

চোঙা-ফোঁকা—সকাল থেকেই বন্ধ। ক'দিন যা ডামাডোল গেছে। সে তুলনায় সারাদিন আজ একটু শান্তিতে কাটানো যাবে।

কাল আপিসঘরে গিয়ে দেখি কোন্ এক মিশন থেকে কয়েকটা বাইবেল উপহার পাঠিয়েছে। তার থেকে একটা আমি পড়ব ব'লে চেয়ে নিয়ে এসেছি।

খবরের কাগজও এনেছিলাম দু-একদিন ধার ক'রে। ইদানীং আর আনি না। কাগজ পড়ার ইচ্ছেটাই চলে গেছে।

কত বছর পর এই নবজীবনগড়েই আমি প্রথম কাগজ পড়লাম। একসময়ে ছিলাম খবরের কাগজের পোকা। কাগজ না পড়লে ভাত হজম হত না। তাই কাগজ দেখে হঠাৎ সেই পুরনো উৎসাহটা চাগিয়ে উঠেছিল। বড়বাবুকে ব'লে কাগজটা নিয়ে একরকম ছুটতে ছুটতে ঘরে এসেছিলাম।

সেদিন প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছিল ভূমিকম্পে একটা শহর নিশ্চিহ্ন হওয়ার খবর। তার নিচে একটা হিসেব ছিল আমেরিকা কোথায় কোথায় যুদ্ধের ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। কোথায় মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে প্রত্নপ্রস্তর যুগের কত কী নতুন নিদর্শন।

পড়তে গিয়ে আমি যে কী হতাশ হয়েছিলাম বলার নয়। একটা খবরও আমার নতুন ব'লে মনে হল না। স্থানকালপাত্রের নামগুলো ছাড়া আর সবই তো সেই থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়ি থোড়। দুনিয়া তাহলে কোথায় বদলেছে?

যুদ্ধ আর ধ্বংস, ক্ষুধা আর নগ্নতা, লোভ আর হিংসা—এর কি নিবৃত্তি নেই?

এরপরেও দুচারবার কাগজে চোখ বোলাতে চেষ্টা করেছি। ভেঙে যাওয়া আগ্রহ আর জোড়া লাগাতে পারিনি।

তাকিয়ে দেখলাম চ্যাংমুড়ি তখনও ঘুমোচ্ছে। ওর যেরকম এখন তখন অবস্থা তাতে এখন যত ঘুমিয়ে নিতে পারে ততই ওর পক্ষে ভালো।

হঠাৎ মনে হল, বাইরে কে ডাকল না?

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি ভোঁভাঁ। তার মানে, ভুল শুনেছি। ঠায় ব'সে থেকে পাদুটো ধরে যাওয়ায় একটু দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ভেঙে পায়ের ধরা ভাবটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি, এমন সময় দেখি দুই মূর্তিমান আসছে—পল্টন আর আংটি। পল্টনের হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ওদের পেছনে আরও দুজন। একজন বাতাসী। আরেকটি কে? পরনে লুঙ্গি আর গায়ে একটা বাহারে মেরজাই।

ওরা কাছে আসতে পল্টন আলাপ করিয়ে দিল।

'এই আমার মামু। এতদিন বিদেশবিভুঁইতে ছিল। তারপর কিভাবে খবর পেয়ে এখানে চলে এসেছিল। আমাকে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজের কাজে লাগাবে ব'লে। পরে আংটিও যাবে।'

মামাটি কেমন? পল্টন থাকবে জলে আর আংটি থাকবে ডাঙায়?

কিন্তু আমি ওসব বলবার কে ? পল্টনকে বুকের মধ্যে নিয়ে একটু আদর ক'রে বললাম, 'সাবধানে থাকিস।' তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে খানিকটা যেন আত্মগতভাবেই বললাম, 'যাওয়ার ব্যাপারে পল্টনই তাহলে প্রথম হল।'

ওরা এগিয়ে চলে গেলে আমি ঘরে ফিরে এসে কাঠকুটোতে আগুন দিয়ে খানিকটা চায়ের জল বসিয়ে দিলাম। একেবারে চা-টা ক'রে নিয়ে গিয়ে চ্যাংমুড়িকে ডাকব।

হাতের কাছে লাল মলাটের বাইবেলের পাতা ওল্টাতেই ছেলেবেলায় বাড়ির পাশের গির্জায় গাওয়ার কবেকার একটা গান চোখে পড়ল :

'আমাদের ঈশ্বর আছেন স্বর্গে ;'
তাঁর যা ইচ্ছে হয় করেন।
ওদের বিগ্রহগুলো সোনারূপোর,
মানুষেরই হাতে গড়া।
তাদের মুখ আছে, কিন্তু বোল নেই ;
চোখ আছে, কিন্তু দৃষ্টি নেই।
কান থেকেও তারা শোনে না।
নাক থেকেও তারা গন্ধ পায় না।
হাত আছে, কিন্তু সাড় নেই ;
পা আছে, কিন্তু হাঁটে না ;
কোনো শব্দই বেরোয় না ওদের গলা দিয়ে।
যারা তাদের তৈরি করে, তারাও তাদেরই মতন ;
তাদের ওপর যারা বিশ্বাস রাখে, তারাও সব সেইরকম।'

pathagar.net

ততক্ষণে জল ফুটে গেছে। গেলাসে চা ঢেলে চ্যাংমুড়িকে ডেকে দিতে যাচ্ছি হঠাৎ চেয়ে দেখি ওর শাড়ি রক্তে ভিজে চপচপ করছে। রাস্তার একজনকে ধ'রে তক্ষুণি খবর পাঠালাম বড়বাবুকে।

ভবীকে নিয়ে বড়বাবুর আসার আধঘণ্টার মধ্যে এসে গেল হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স।

হাসপাতালে গিয়ে দেখি আমরা যাওয়ার আগেই খবর পেয়ে ডাক্তারবাবু সেখানে হাজির।

ওঁকে দেখে আমাদের সকলেরই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এখন যাকে দিয়ে যা করাবার ডাক্তারবাবুই করবেন।

বিকেলের দিকে ডাক্তারবাবু এসে বললেন, 'মনে হচ্ছে অবস্থাটা এখন খানিকটা সামলানো গেছে। তবে আপনাদের কাছে তো লুকিয়ে লাভ নেই,

এখনও দুটো দিন কাটলে তবেই জোর ক'রে কিছু বলা যাবে। আপনারা চলে যান, আমিও বাড়ি যাচ্ছি। রাত্তিরে আমি থাকব। যখন আপনাদের আসবার দরকার হবে আমি খবর দেব।'

ভবী কিছুতেই কথা শুনলেন না। রাতের খাবারটা বড়বাবুর বাড়ি থেকেই এল। আমার স্বভাব ওঁরা জানেন। তাই বাড়ি বয়ে এসে কেউ আমাকে বিরক্ত করেননি।

সন্ধ্যেবেলা অনেকক্ষণ আমি ঘর অন্ধকার ক'রে ব'সে রইলাম। অনেকদিন পর আবার আমি একা। খুব যে খারাপ লাগছিল তা বলতে পারব না।

চ্যাংমুড়ির জন্যে চিন্তা হচ্ছিল তো বটেই, কিন্তু খুব একটা ভয় হচ্ছিল না। আমি দেখেছি কুষ্ঠরুগীদের জান খুব শক্ত হয়।

ভয়ের কথায় মনে পড়ে গেল। আজ ফিরে আসার সময় গেটের বাইরে কয়েকটা পোস্টার দেখলাম। পোস্টারগুলো বাইরের লোক এসে মেরে গেছে ব'লে মনে হয় না। এক দিনেও কেউ যখন ছেঁড়েনি, তখন ভেতরের লোকের যে সায় আছে তাতে সন্দেহ নেই।

পাশাপাশি দুটো পোস্টার। বানান ক'রে ক'রে পড়লাম। একটাতে 'হিন্দুদের পোড়াতে হবে।' কী কাণ্ড! 'মরে গেলে' কথাটাই উহ্য! 'মুসলমানের চাই আলাদা কবরখানা।' তার ঠিক নিচে : 'বড়বাবুর স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক।'

ভেতরে যে ভাঙন ধরছে, এতে সেটা আরও স্পষ্ট। এর ওষুধ নেই। দরকার একটা শকথেরাপির। বাইরে থেকে বড় রকমের একটা ঘা পড়লেই সব আবার যে-কে সেই হয়ে যাবে। যারা মনে করছে তাদের ইহকাল গেছে, তারাই এখন পরকাল নিয়ে মেতে উঠেছে। আমার বা চ্যাংমুড়ির সে বালাই নেই। দুজনের অবশ্য আলাদা আলাদা কারণে।

আগে বিয়ে হলেও চ্যাংমুড়ির হবে এই প্রথম সন্তান। যদি মেয়ে হয়, আমার তো তাই ইচ্ছে, তাহলে কি চ্যাংমুড়ির মতই দেখতে হবে? একদা চ্যাংমুড়ি যেমন দেখতে ছিল! কেমন দেখতে ছিল আমি আর তার কী জানব। তবে শুধু মেয়েই বা বলছি কেন, অনেক সময় ছেলের মুখেও তো মায়ের মুখ অবিকল বসানো থাকে।

শুধু এই একটা কারণেই আমি কৌতূহলে টান টান হয়ে আছি।

আমার খাওয়াদাওয়া অনেক আগেই শেষ।

অন্যদিন রাত দশটা বাজলেই নবজীবনগড়ের আলো নিভে যায়। আজ সাড়ে দশটার ঘণ্টা পড়ল, তবু তো আলো চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

কাল ভোরবেলায় ভোটপর্ব শুরু হবে, আজ রাত জেগে তারই বোধহয় তোড়জোড় চলেছে।

আলো যখন রয়েইছে তখন বাইবেলটা আরেকবার না উল্টে পারলাম না।

সকালে বড়বাবু নিজে এসে চ্যাংমুড়ির খবর দিয়ে গেলেন। কাল সারারাত ডাক্তারবাবু হাসপাতালে ছিলেন। উনি বললেন ওষুধে কাজ দিয়েছে। এখন শুধু একটু নজর রাখার ব্যাপার। মনে হচ্ছে ব্যথাটা আজই উঠবে। বিকেলের দিকে উনি আবার খবর দেবেন।

সকালে যখন হাসপাতালে যেতে হচ্ছে না, তখন আর ভোটটা নষ্ট ক'রে কী হবে? কাজেই ভোটটা দিয়েই এলাম।

বুথে টিমটিম করছে বাইরের লোক। সব ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। বুঝলাম যাদের নেহাৎ পেটের দায় শুধু তারাই এসেছে। প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট সেজে যারা বসে আছে তারা সবাই নবজীবনগড়েরই লোক। নিজের নিজের ভোট দিয়ে এসে তাদের কাজের মধ্যে তো দেখলাম শুধু পেন্সিল কামড়ানো। বেচারাদের পেটে তো ওর বেশি বিদ্যে নেই।

ভোট দিতে এল না শুধু দুজন। চ্যাংমুড়ি আর পল্টন। ওদের কথা সবাই জানত ব'লে দুপুরের মধ্যেই ভোটপর্ব চুকে গেল।

ঘরে ফিরে এলাম।

খুব ক্লান্ত লাগছিল। ভাবলাম লম্বা হয়ে একটু জিরিয়ে নিই। তারপর উঠে একটু চালেডালে ফুটিয়ে নিতে আর কতক্ষণ?

কিন্তু কখন দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে গিয়েছিল।

pathagar.net

নবজীবনগড় থেকে চলে এসেছি কাউকে কিছু না ব'লে। লোকে ভাববে চ্যাংমুড়ির মারা যাওয়াই আমার চলে আসার কারণ।

ওর মারা যাওয়াটা আমার কাছে খুবই দুঃখের, তাতে সন্দেহ নেই। ডাক্তারবাবু এই বলে কপাল চাপড়েছিলেন যে, উনি বাড়িতে না চলে গেলে এটা হত না।

হয়ত তাই। সারা ঘরে একজন নার্স। চ্যাংমুড়ির ব্যথা ওঠায় বিছানায় আছাড়িপিছাড়ি করছিল। তখন ওকে দেখা মানে তো ধরা। কোন্‌টা আগুনে-পোড়া আর কোন্‌টা কুষ্ঠের ক্ষত ওরা সব জানে। জানে বলেই ধরবার সাহস হয়নি।

ফলে খাট থেকে চ্যাংমুড়ির পড়ে যাওয়া আটকায়নি। তলায় একটা ছোট টুল রাখা ছিল। চ্যাংমুড়ির পেটটা পড়েছিল ঠিক তার ওপর। কাজেই শেষ পর্যন্ত দুটোর একটিকেও বাঁচানো যায়নি।

তীরে এসে এভাবে তরী ডুববে, এটা আমরা দুজনের কেউই ভাবিনি। ওর

অদৃষ্ট আরেকটু অপেক্ষা ক'রে ওকে ওর বাচ্চার মুখ একটু দেখিয়ে তারপর ডেকে নিয়ে গেলেই পারত।

হাসপাতালে আমি লিখে দিয়ে এসেছি : কুলসুমের একটাই ভালো চোখ। সেটা যাবে আই-ব্যাঙ্কে। ওর বডিটা নেবে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ—দরকারমত ওঁরা ওটাকে কাজে লাগাবেন।

ঐ একই ইচ্ছের কথা জানিয়ে আমার সই-করা একটা চিরকুট আমি এখন সব সময় আমার সঙ্গে রাখি। জীবনটা গেলেও শরীরটা যেন বৃথা না যায়।

কাল সন্ধ্যেবেলায় এই জংশন স্টেশনটাতে এসে নেমেছি।

এখনও কিছু ঠিক করিনি কোথায় যাব।

নবজীবনগড়ের সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে এসেছি। একবার যা ছেড়ে আসি আমি আর কখনও সেখানে যাই না।

আমার স্বভাবটা সত্যিই অদ্ভুত।

সেদিন যেমন হাসপাতালে সকলেই এমন কি দেখে মনে হয়েছিল ডাক্তারবাবুও—সবাই আশা করেছিল আমার চোখ দিয়ে জল পড়বে।

চোখের জল ফেলাটা আমার পক্ষে মোটেই শক্ত ছিল না। কিন্তু ভেতরের জিনিসটাকে সবার মধ্যে হাট ক'রে দিতে আমার বাধে। তবে হাজার একা থাকলেও যাকে ফুলে ফুলে কান্না বলে কখনই তা নয়। চোখ দিয়ে সমানে জল পড়ে আর শক্ত ক'রে ঠোঁট দুটো চেপে রাখি।

এটা ঘটেছিল এতদিন পর কাল রাত্রে।

রাত্তিরে ছিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ওভারব্রিজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা মালগাড়ির ইঞ্জিন দূরের কেবিনঘর ছাড়িয়ে চলে গেল।

ট্রেনটা মিলিয়ে যেতেই আমার সামনে চাঁদের আলো পড়ে রেললাইনের পাথরগুলো সাদা ঝকঝক করতে লাগল।

হঠাৎ আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে লাগল। কে যেন দিগন্ত অব্দি বিছিয়ে দিয়েছে সাদা একটা চাদর। আমি সেটা তুলতে ভয় পাচ্ছি। পাছে তার তলা থেকে বেরিয়ে আসে সাদা কাগজের মত রক্তহীন ঠোঁটের কোণে হাসি-ফোটানো একটা শরীর।

আর সেই মুহূর্তে মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে এল সর্বাঙ্গে ক্ষতদুষ্ট ব্যথাকাতর জোর-এর সেই খেদ :

'মনে রেখো এখন আমার জীবন বলতে একটা নিশ্বাস ;

আমি আর কোনোদিনই আমার চোখে ভালো দেখব না।

তার যে চোখ আমাকে দেখে থাকে, আমি এখন থেকে তার দৃষ্টিপথের

boierpathshala.blogspot.com

বাইরে ;

আমার ওপর যখন তোমার চোখ পড়বে, দেখবে আমি নেই।
মেঘ হালকা হতে হতে যেমন উধাও হয়ে যায়,
তেমনি সে পাতালে নেমে গিয়ে আর উঠবে না ;
ঘরে আর সে ফিরবে না,
তার নিজের জায়গায় কেউ আর তাকে চিনবে না।'

এরপর কোথায় যাব এখনও কিছুই জানি না। বলেছিলাম না, এখন আমি নিজেকে পেছন থেকে দেখি।

এইভাবে দেখার ফলে, একেবারেই নিজের মুখ দেখতে পাই না। মনে কখন কী হচ্ছে, মুখ দেখে সেটা আঁচ করারও কোনো উপায় নেই।

ওহো, একটা কথা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

হাসপাতালের উঠোনে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যখন দাঁড়িয়ে কথা বলছি, চোখ কুৎকুৎ করতে করতে একটা লোক এগিয়ে এল।

চেয়ে দেখি হাজী সাহেব। আর তাঁর সঙ্গে ফিচেল মতন দেখতে এক মৌলবী।

হাজীসাহেব ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'একটা কথা ছিল।'

আমি স্বাভাবিক ভাবেই বললাম, 'বলুন।'

'কুলসুম ছিল আমার বউ।'

একটু চম্‌কে উঠেছিলাম। তবু মচকালাম না। ছোট্ট ক'রে শুধু বললাম, 'ও'।

'তাহলে ওকে কবর দেওয়া হবে তো ?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

মৌলবীটি একটি চিজ। সে বলল, 'তাহলে বড়বাবুকে বলুন। কিছু তো খরচা আছে।'

যা আমি জীবনে কক্ষনো করি নি, এবার সেটাই ক'রে বসলাম। রাগে কাঁপতে কাঁপতে

'অনুবাদ এইখানেই শেষ করতে হল। এটা ছিল মূল লেখার শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইন। হয়ত এরপর আরও একটা পৃষ্ঠা ছিল। এমনও হতে পারে যে, লেখার কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল। দুএক লাইন আগে থেকেই লেখা যে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এক্ষেত্রে মূলের অনুগত থাকা ছাড়া অনুবাদকের আর কীই বা করার আছে ? লেখক যেটা শেষ করেননি বা যেখানে তাঁর ছাড় গেছে—অনুবাদকের কী অধিকার সেখানেও কলম চালিয়ে যাবার ?'

pathagar.net

boierpathshala.blogspot.com